

পার্শ্ব জগতের অপার্শ্বতা বিশ্লেষণ

অনন্ত বিজয়

পার্শ্বজগতের জল, বায়ু, আহাৰ্যের স্বাদ নিয়ে আমরা মানুষ, পশু-উদ্ভিদ সকলেই পার্শ্ব জগতে বেঁচে আছি। জগতের রূপ-রস-গন্ধ আমাদের মনকে ভরিয়ে তুলে, আনন্দ জোগায়। আমাদের ভালো-মন্দ-সুস্থতা-অসুস্থতা সবকিছুই এই পার্শ্বজগতকে কেন্দ্র করে। যেমন ধরুন, দেখা সাক্ষাতের সময় প্রায়ই একে অপরকে জিজ্ঞেস করি, কেমন আছেন? প্রত্যুত্তর আসে—ভালো আছি অথবা ভালো নেই। এই ভালো থাকা বা না-থাকা সবই ইহজাগতিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে। আমরা সুখস্বপ্ন-কল্পনায় দেখি—জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, বিত্তশালী হওয়া, ব্যাপক পরিচিতি লাভ ইত্যাদি; এ সবই কিন্তু পার্শ্বজগতে চাই। শোনা যায়, কেউবা স্বপ্নে স্বর্গ-নরক দেখেছেন। স্বর্গের অতিমনোমুগ্ধকর পানাহার, অবাধ স্বাধীনতা অথবা নরকের আগুনে দগ্ধ পাপী-তাপীর তীব্র কষ্টের রেশ কিন্তু এই ইহজগতে পেয়ে থাকি। আমরা কোথাও এমন কিছু কল্পনা করতে পারি না, যা ইহজগতে নেই; বোধ করি, কোনো না কোনোভাবে এই বস্তুজগতকে কেন্দ্র করে আমাদের যাবতীয় চিন্তার পরিধি। এরপরও অনেকে বলেন, অতিপ্রাকৃত শক্তি অথবা ঈশ্বর (গড, আল্লাহ, ইয়াহুয়া ইত্যাদি) কোনোভাবেই পার্শ্বজগতের অধীন নয়। কিন্তু ঈশ্বরের যে সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর অনুগতরা প্রকাশ করে থাকেন, যেমন—সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, সর্বস্থানব্যাপী বিরাজমান ইত্যাদি, আসলে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় ওগুলো—যেমন শক্তিমত্তা এই বস্তুজগতেরই অধীন, প্রায়শ দেখি শক্তিমানদের প্রতি বেশিরভাগ মানুষ ভীতি-শ্রদ্ধা-সম্মত বজায় রেখে চলে, গর্বভরে ঘোষণা করে, 'বীরভোগ্য বসুন্ধরা'; জ্ঞান অন্বেষণের স্পৃহা সকল মানুষেরই আছে, কিন্তু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বে সে সর্বজ্ঞানী হতে পারে না, আর স্থান-কাল-পাত্র তো বস্তুজগতের অধীন। এভাবে ঈশ্বরের সংজ্ঞায় ঈশ্বরকে ভাঙলে বুঝা যায় অতিপ্রাকৃতের শিরোমনি ঈশ্বর সামান্য তৃণসমমানুষের চিন্তার একটু বর্ধিতরূপ মাত্র। এজন্যই হয়তো পার্শ্বজগতের জ্ঞানী-গুণী-বিজ্ঞানী-দার্শনিকেরা বলেন—অতিপ্রাকৃত-অপার্শ্ব-অলৌকিক বলতে কিছুই নেই; যা আছে, তা এই পার্শ্বমানুষেরই কাল্পনিক সৃষ্টি। আরো বলেন—পার্শ্বজগতে বিশ্বাসী কিংবা পার্শ্বজগতে অবিশ্বাসী নির্বিশেষে পার্শ্বজগতের সকল মানুষসহ—সকল প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়, বিশ্ব-মহাবিশ্বের সবকিছুই পার্শ্ব প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত। কিন্তু একমাত্র মনুষ্যপ্রজাতি বাদে অন্য কোনো প্রাণীর (উদ্ভিদসহ) ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়নি, পার্শ্বজগতের প্রতি তার অবিশ্বাস; অপার্শ্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষা-বাসনা-লালসা। হয়তো এ বক্তব্য দেখে কেউ কেউ বলবেন—"মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণীর জ্ঞান এত উন্নত নয় যে ওরা অপার্শ্বের সন্ধান পাবে; আমরাই মানুষেরা অপার্শ্বের কল্যাণে একমাত্র *আশারারফুল মাকলুকাত!*" কিন্তু আমাদের দীর্ঘকালের কঠোর অধ্যবসয়ে লব্ধ বিজ্ঞান ভিন্ন কথা বলে, বলে—পৃথিবীর যাবতীয় অপার্শ্বতা আমাদের মধ্যেই বিরাজমান, সবকিছু পার্শ্ব কারণেই সৃষ্ট। এও বলে, পার্শ্বতা সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট না থাকা এবং পার্শ্বতা সম্পর্কে এখনো সবকিছু না জানার কারণে—ভয়ে, লোভে, লালসায়, ভণ্ডামিতে, সস্তা প্রচারের মোহে আবিষ্ট হয়ে পার্শ্বতা ভুলে অপার্শ্বতার জয়গান গেয়ে বেড়াই, তথাকথিত অলৌকিকতার পায়ের মাথা নত করে আত্মসম্মতি লাভ করি, গুটিকয়েক শোষণ-ভণ্ড-প্রতারক-প্রবঞ্চক-মানসিক রোগীদের (তথাকথিত) ঈশ্বরের প্রতিভূ বানিয়ে আমাদের একমাত্র পার্শ্বজগৎ তাদের জন্য উৎসর্গ করে ফেলি। এতে মনুষ্যজীবনের ক্ষতি ভিন্ন লাভ মোটেই হয় না। যুগ যুগ ধরে রক্ত পানি করা শ্রমে উপার্জিত অর্থ অন্যায়ে-অসাম্য টিকিয়ে রেখে ভণ্ডের দলের লুটে নেয়া—চেয়ে-চেয়ে দেখা ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে পারি না। আমাদের অপ্রাপ্তি-আর্তনাদ-ক্ষোভ-চোখেরপানি-হাহাকার—সবই অপার্শ্বতার দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে আছে; জনগণের সাম্যবাদের স্বপ্ন সুদূর আকাশে পাড়ি জমিয়েছে, ধরণীতে জনগণতন্ত্র শেকলবদ্ধ হতে চলছে অপার্শ্বতার কারণে—এ বাস্তবতায় এই প্রবন্ধে দীর্ঘসময়

ধরে বহুল প্রচারিত বেশকিছু জনগুরুত্বপূর্ণ (!) তথাকথিত অপার্শ্বিকবিষয়সমূহকে নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করা হবে, সভ্যতা-ভব্যতার নামে এঁটে থাকা মুখোশ উন্মোচন করে কতিপয় অতিলৌকিকতার প্রতিভূদের কুৎসিৎ নগ্নরূপ উপস্থাপন করা হবে। আশা করি পাঠক, সত্য উদ্ধরণের এই সৎপ্রচেষ্টায় আপনারা সঙ্গে থাকবেন এবং এ সম্পর্কিত যেকোনো ভিন্নমত-মতবিরোধ-তথ্যের ঘাটতি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্দিধায় জানাবেন।

(১) ঈশ্বর দর্শন ও অলৌকিক অনুভূতি :— পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বহু ধর্মীয় মহীয়সী মহাপুরুষ-নবী-সাধক-ঠাকুর-পীরবাবা-মৌলভির খবর পাওয়া যায়, যারা নিজ-নিজ ধর্মের ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। যেমন ইহুদিদের নবি হযরত মুসা সিনাইপর্বতে গিয়ে ঈশ্বরের সাথে দেখা করেছেন; ইসলাম ধর্মে হযরত মোহাম্মদ দীর্ঘ বিশ বছরের অধিক জিব্রাইল নামক অপ্রাকৃত সত্তার সাথে যোগাযোগ রেখে আল্লাহর কাছ থেকে কোরানের বাণী ধারণ করেছেন এবং একসময় বুরাক নামক আধা ঘোড়া-আধা পাখি পশুর পিঠে চড়ে বেহেশত-দোজখ প্রদক্ষিণ করে এসেছেন এমন কী স্বয়ং আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছেন; আর খ্রিস্ট ধর্মে হযরত যিশু স্বয়ং নিজেকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে দাবি করেছেন। হিন্দুধর্মে তো এরকম অবতারবাদ বা দেবতাদর্শন কাহিনীর অভাব নেই, ঘরে ঘরে প্রায়ই এরকম কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়; কেউবা ঈশ্বরকে স্বপ্নে দেখেছেন, কেউ সামনা-সামনি দেখেছেন, কেউ ঈশ্বরের শব্দ শুনেছেন, কেউ ঈশ্বরের সাথে কথা বলেছেন, আলোচনা করেছেন, ধর্মপ্রচারের জন্য পরিকল্পনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের কালীমায়ের সাথে সাক্ষাৎ, লোকনাথের শিবের অবতার ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মেই এরকম কম বেশি মহাপুরুষের কাহিনী আছে, যারা স্বয়ং ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন অথবা দূত মারফত সময়-সময় বাণী পেয়েছেন। আবার এও শোনা যায়, কেউ কেউ নিজেকে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে দাবি করেছেন, কারোবা শরীরে ঈশ্বর এসে ভর করেছেন (হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে এরকম মজার-মজার 'অবতার' আবির্ভাবের গল্প বলতে গেলে শোনা যায় না)। সারা পৃথিবীতে এরকম অসংখ্য অতিপ্রাকৃত শক্তির সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কৌশলি-আবেগময় সরল(?)বক্তব্য আমরা আমজনতা নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করেছি যুগ যুগ ধরে, নিজেদের উজাড় করে দিয়ে মহাপুরুষের পদসেবা করেছি, প্রার্থনা করেছি রাতদিন এক করে^(১), নিজেরা অন্ন গ্রহণ না করে পুণ্য লাভের আশায় গুরুর পাতে তুলে দিয়েছি, গুরুর আশির্বাদ লাভের আশায় ইহকাল-পরকাল সব এক করে দিয়েছি তবুও আমাদের, গুরুর সেবা করার তৃপ্তি মেটেনি। এ জনতার কাতারে মন্ত্রী থেকে ফকির, শিক্ষিত থেকে অশিক্ষিত, আমলা থেকে কামলা সঙ্কলেই আছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়, আমাদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত অতিপ্রাকৃতশক্তি ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন, ঈশ্বরের অবতার, অলৌকিক নানা অনুভূতি ইত্যাদির দাবিদারেরা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিছকই একজন মানসিকরোগী। আর নয়তো ভণ্ড-প্রতারক মাত্র^(২)। বিজ্ঞান, বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, এ ধরনের মানসিকরোগীদের ঠিকমতো চিকিৎসা হলে মানসিক ভ্রান্তি দূর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে; ফিরে আসতে পারেন সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, সুইজারল্যান্ডের মনোবিজ্ঞানী ডঃ ওয়াল্টার হেজ, আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ডঃ জেমস ওল্ডস, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের জে. ডেলগাজোসহ বিশ্বের আরো বহু মনোবিজ্ঞানী মানুষের মনে (চিন্তায়) ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরেরবাণী শোনার অনুভূতি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন, শুধু তাই না, তাঁরা দেখিয়েছেন বাহির থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকোষে উত্তেজনা ও নিস্তেজ অবস্থার সৃষ্টি করে আধ্যাত্মিক অনুভূতিসহ প্রেম, ঘৃণা, ভয়, সাহসের অনুভূতি তৈরি করা সম্ভব। তবে যদি কেউ ইচ্ছাকৃত অভিনয়ের মাধ্যমে অপার্শ্বিক অনুভূতি নিয়ে প্রতারণা করে থাকেন, তাহলে বিজ্ঞান কেন, কারো বাপেরও সাধ্য নেই—এদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। শুধু নিশ্চিত করতে পারে কারাদণ্ড।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি, বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঈশ্বর দর্শন-অলৌকিক অনুভূতি সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে—মনোবিজ্ঞান (Psychology) এবং মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বিচিত্র কর্মকাণ্ড সম্পর্কে।^(৭) মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের একটি বিশেষ ধর্ম হলো গতিময়তা। সবার মস্তিষ্কের গতিময়তা সমান নয়, অর্থাৎ উত্তেজনা-নিস্তেজনাতে দ্রুত সাবলীলভাবে মানিয়ে কাজ করার ক্ষমতা সমান নয়। কেন নয়? কারণ—এই মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। সামাজিকীকরণের সময় যারা বিদ্যা-শিক্ষা-জ্ঞান সুস্থভাবে লাভ করেছে অর্থাৎ মূলত যারা চর্চা করার বেশি সুযোগ পেয়েছে—তাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের গতিময়তা বেশি, তারা যেকোন বিষয়ে চটপট বুঝতে পারে, মানিয়ে নিতে পারে সহজেই। আর যাদের সামাজিকীকরণ ভাল হয়নি, পরিবেশের কারণে বিদ্যা-শিক্ষা-জ্ঞান আহরণ-চর্চা করার সুযোগ কম পেয়েছে তাদের স্নায়ুকোষের গতিময়তা কম বা দুর্বল হয়ে থাকে, তাদের যাচাই-বাছাই করার মানসিকতাও থাকে কম, তারা সহজেই আক্রান্ত হয় কুসংস্কারে, অপবিশ্বাসে কিংবা বিভিন্ন মানসিক রোগে। এ সমাজে বহুল প্রচলিত তথাকথিত বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত/অলৌকিক ভ্রান্ত অনুভূতিকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় ইলিউশন (Illusion), হ্যালুশিনেশন (Hallucination), ডিলিউশন (Delusion), প্যারানোইয়া (Paranoia) বলে থাকে; এবং ব্যক্তির ওপর জিন-ভূত-দৈত্য-দানো-পরী-রাফস-খোফস থেকে শুরু করে খোদ খোদা-আল্লাহ-ভগবান-ঈশ্বর-ইয়াহুয়া ইত্যাদি সকল অতিপ্রাকৃত শক্তির অবতার কিংবা ভর মনোবিজ্ঞানের ভাষায় হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মানসিকঅসুখ। যেমন হিস্টেরিয়া (Hysteria), এপিলেপ্সি (Epilepsy), ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ (Maniac Depressive), স্কিটসোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) ইত্যাদি।^(৪) মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, অপার্শ্বিক/অপ্রাকৃতঅনুভূতির কিংবা মানসিকরোগগুলোর পৃথক পৃথক উপসর্গ থাকলেও একজন ব্যক্তির মধ্যে পৃথক পৃথক উপসর্গগুলো একসাথে বিরাজ করতে পারে; এবং প্রায়ই একসাথে বিরাজ করেও।

এখন এ সকল ভ্রান্তঅনুভূতি এবং মানসিকরোগ নিয়ে ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক—বাস্তব জীবনে আমরা সবাই ইলিউশন বুঝলে বা না-বুঝলেও এর সাথে পরিচিত আছি। মনোবিজ্ঞান বলে, ইলিউশন বা ভ্রান্ত অনুভূতি হচ্ছে—"কোনো বস্তু প্রকৃতপক্ষে যা, তাকে সেইভাবে উপলব্ধি না করা।" যেমন—একটি গ্লাসে পানি নিয়ে সোজা চামচ ডুবিয়ে রাখলে, চামচটিকে আর সোজা দেখা যায় না, কিছুটা বাঁকা দেখায়। কারণ, এখানে পানি ও বাতাসের প্রতিসরাঙ্ক আলাদা হবার জন্য আমাদের দর্শনানুভূতি ভুল করেছে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রোদেলা দুপুরে পিচ ঢালা রাস্তাকে ভেজা ভেজা মনে হয়, মরুভূমিতে মরীচিকা কিংবা রাতের অন্ধকারে দড়িকে সাপ ভাবার কথা সবাই জানি; এগুলো ভ্রান্ত দর্শনানুভূতির উদাহরণ। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে এ ধরনের ভ্রান্তিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা:— (১) দর্শনানুভূতির ভ্রম (Optical/Visual illusion), (২) শ্রবণানুভূতির ভ্রম (Auditory illusion), (৩) স্পর্শানুভূতির ভ্রম (Tactile illusion), (৪) ঘ্রাণানুভূতির ভ্রম (Olfactory illusion), (৫) স্বাদগ্রহণের বা জিহ্বানুভূতির ভ্রম (Taste illusion)। মনোবিজ্ঞানীরা সংক্ষেপে বলেন—ইলিউশন হলো প্রত্যক্ষণের ভুল। ইন্দ্রিয়গ্রাহী উদ্দীপকের প্রভাবে প্রত্যক্ষণ বা উপলব্ধি হয় বলে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যেকোনো একটির জন্যই ইলিউশন হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, এই ভুলের জন্য আমাদের ইন্দ্রিয় কিন্তু দায়ী নয়, স্নায়ুসংকেত বিশ্লেষণে মস্তিষ্কের অক্ষমতাই এই ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। শুধু মানসিক বা শারীরিক অসুস্থতাদেরই ইলিউশন হয় না, সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষদেরও ইলিউশন হয়ে থাকে (পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিভ্রম ঘটলেও সচরাচর বেশি ঘটে থাকে দৃষ্টি ও শ্রবণজনিত ইলিউশন)। শ্রবণজনিত ইলিউশন হলো একটা শুনতে গিয়ে অন্য কিছু শোনা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘোরের মধ্যে থাকলে এরকম ঘটে থাকে। যেমন কারো আসার অপেক্ষাতে খুব উত্তেজিত হয়ে থাকলে হঠাৎ টেলিফোন কিংবা অন্য কিছুর শব্দকে মনে হয় কলিংবেলের শব্দ। আবার শরীরে হঠাৎ করে সুতোর স্পর্শ লাগলে অনেকে বিছে ভেবে লাফ দিয়ে ওঠেন,

স্পর্শানুভূতি ভ্রমের উদাহরণ। ভেজা সুপারি থেকে অনেক সময় খুব নোংরা গন্ধ আসে, এটাকে অনেকে নর্দমার ময়লা-আবর্জনার গন্ধ বলে ভুল করেন; যা ঘ্রাণানুভূতির ভ্রম। মিষ্টি খাওয়ার পর চা খেলে খুব তিক্ত স্বাদ লাগে, এটি স্বাদ গ্রহণের ভ্রম।— পাঠক এখানে ইলিউশন সম্পর্কিত খুব সাধারণ কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল, আপনার চারপাশেই আরো হাজার-হাজার উদাহরণ পাবেন; শুধু একটু নজর দিলেই চলবে। বলা যায় ইলিউশন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণেই—গ্রামে-গঞ্জে-শহরে জিন-ভূত-প্রেত দেখার ভয়ঙ্কর সব কাহিনী এখনো প্রচুর শুনতে পাওয়া যায়; জন্মের পর থেকে শৈশব, শৈশব পেরিয়ে কৈশোর পর্যন্ত তথাকথিত অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্পর্কে শুনতে শুনতে নিজের অজান্তে এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মে যায়, চিন্তার কুঠরিতে ভক্তি-ভয়ের সৃষ্টি হয়। ফলে হঠাৎ করে ইলিউশন হলে ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন, ভূতের দেখা পেয়েছেন বলে ভয় পান অথবা অন্য কোন অলৌকিক সত্তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে মনে করেন। এদিকে হ্যালুশিনেশন বা অলীক প্রত্যক্ষণ—কোন কিছু বাস্তব অস্তিত্ব নেই, কিন্তু তাকে দেখতে পাওয়া/শুনতে পাওয়া/স্পর্শ পাওয়া/স্বাদ পাওয়া/ঘ্রাণ পাওয়ার অনুভূতিকে বলে থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখা আর জাগ্রত অবস্থায় অলীকপ্রত্যক্ষণ একই ধরনের শারীরবৃত্তিক ব্যাপার। আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষণ করি, তখন ওই বস্তুটির একটি ছাপ আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে রয়ে যায়। ফলে প্রয়োজন মত কল্পনার মধ্যে বস্তুটির প্রতিবিম্ব অবলোকন করতে পারি ঐ বস্তুর বাস্তব উপস্থিতি ছাড়াই; কিন্তু কল্পনার প্রতিবিম্বটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মত উজ্জ্বল হয় না। উপলব্ধিজনিত উত্তেজিত স্নায়ুকোষগুলোই আমাদের মস্তিষ্কে ধারণা ও কল্পনার উৎস। কোনো কারণে আমাদের চিন্তায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের স্বাভাবিক ধর্ম উত্তেজনা (excitation) ও নিস্তেজনা (inhibition)-তে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অতিরিক্ত টেনশন বা দুশ্চিন্তার ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের উত্তেজনা বিন্দুগুলো ধীরে-ধীরে নিস্তেজিত হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে; তখন উত্তেজিত কোষগুলো অনড়ত্ব লাভ করে; এর দরুণ মস্তিষ্কে বাস্তবের বিকৃত ও অতিরঞ্জিত প্রতিফলন ঘটে। একে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় হ্যালুশিনেশন বলে আর আমরা সাধারণেরা ঈশ্বর দেখেছি, ভূত দেখেছি বলে বিভ্রান্ত হই। পঞ্চেন্দ্রিয়ের ওপর ভিত্তি করে হ্যালুশিনেশনকেও পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) দর্শনানুভূতির অলীকভ্রম (Optical/Visual Hallucination), (২) শ্রবণানুভূতির অলীকভ্রম (Auditory Hallucination), (৩) স্পর্শানুভূতির অলীকভ্রম (Tactile Hallucination), (৪) ঘ্রাণানুভূতির অলীকভ্রম (Olfactory Hallucination), (৫) স্বাদগ্রহণের বা জিহ্বানুভূতির অলীকভ্রম (Taste Hallucination)। সুস্থ মানুষেরও হ্যালুশিনেশনের অভিজ্ঞতা হতে পারে। কিন্তু যদি এই অভিজ্ঞতা কারোর বারে বারে ঘটে থাকে, তবে তা মানসিক বিকারের লক্ষণ বলে সন্দেহ করতে হবে। এছাড়া মাদকদ্রব্য (আফিম, গাঁজা, চরস, অ্যামিটাল সোডিয়াম, ম্যাডেক্স, ধুতরা ইত্যাদি) সেবনের মাধ্যমেও অলীকবিভ্রম বা Hallucination ঘটতে পারে। এসকল মাদকদ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লাইসারজিক্ অ্যাসিড ডাইএথিল্যামাইড (সংক্ষেপে LSD)। এগুলোকে হ্যালুশিনোজেনস (Hallucinogens) বা মানসিকবিভ্রমকারী ড্রাগ বলে। এসব ড্রাগে টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিল (THC) নামে রাসায়নিক পদার্থ থাকে, এছাড়াও ক্যানাবিনল, ক্যানাবিডিয়ল (একত্রে ক্যানাবিনয়েডস বলে) থাকে। যখন এসব মাদকদ্রব্য শ্বাসের সঙ্গে অথবা ফুসফুস থেকে রক্তে শোষিত হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তখনই শুরু হয় এগুলোর কাজ। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ভারতবর্ষে সাধু-সন্ন্যাসীরা সোমরস-গাঁজা-ভাং-চরস ইত্যাদি উত্তেজক মাদক গ্রহণ করে ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরের কথামত শোনা, তুরীয় আনন্দ ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করে আসছেন। প্রাচীন ঋকবেদে সোমরসের অনেক গুণগান করা হয়েছে এবং সেই বৈদিকযুগে যাগযজ্ঞের সময় মুনি-ঋষিরা সোমরস পান করতেন। তন্ত্রসাধনায় অত্যাবশ্যিক পাঁচটি 'ম'—এর একটি হল মদ। যোগশাস্ত্রের প্রবক্তা পতঞ্জলি বলেছেন, "জন্মোষধিমন্ত্রতপস্যামাধিয়ঃ সিদ্ধয়ঃ" (যোগসূত্র ১৪।১)—অর্থাৎ জন্মসূত্রে, বনৌষধির সাহায্যে, জাদুমন্ত্রোচ্চারণে, কঠোর সংযম পালনে বা মনঃসংযোগের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত শক্তি অর্জিত হয়। শুধু মাদকদ্রব্য গ্রহণ নয়, ডেলিরিয়াম

(Delirium) বা বিকারগ্রস্থ অবস্থায় যেমন প্রবল জ্বর, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, রক্তদূষণ, রিউম্যাটিক ফিভার, থাইরয়েড গ্রন্থির অত্যধিক ক্ষরণ, অস্ত্রোপচারের পরে, মাথায় আঘাত লাগলে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে বিশেষত টেমপোরাল লোব ও মধ্য-মস্তিষ্কে টিউমার, রক্তক্ষরণ ইত্যাদি কারণে অলীকদর্শন (আত্মা-ঈশ্বর-ভূত-প্রেত) হতে পারে। এছাড়া অপারেশনের আগে অ্যানাস্থিসিয়া প্রয়োগ করলে অনেকে মৃত্যুর আশঙ্কায় চরম ভীত হয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে থাকেন, ফলে কেউকেউ চেতনা লোপ পাওয়ার আগে বা অর্ধচেতন অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরের বাণী শোনেন। মেডিকেলের বিভিন্ন কেস হিস্ট্রি থেকে জানা যায় যাদের ভিটামিন বি-ওয়ান বা থায়ামিনের ঘাটতি থেকে বেরি বেরি রোগ হয় বা নিকোটিনিক অ্যাসিডের অভাবজনিত কারণে যে পেলেগ্রা রোগ হয় কিংবা যাদের প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত প্যারাথাইরক্সিন-এর মত কয়েকটি হরমোনের অভাব দেখা দেয়, তাদের মাঝে-মাঝে নানা অস্বাভাবিক প্রত্যক্ষের বিভ্রম বা হ্যালুশিনেশন হয়ে থাকে।

ডিলিউশন হলো বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা; ইলিউশন ও হ্যালুশিনেশনের সাথে ডিলিউশনের চরিত্রগত পার্থক্য আছে, কিন্তু কেউ কেউ এদের তিনটিকে একত্রে ব্যবহার করে থাকেন। কোনো একজনকে দেখে ঈশ্বর মনে হওয়াকে ইলিউশন, কিছুই নেই অথচ সামনে ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়ার অনুভূতি হ্যালুশিনেশন আর ঈশ্বর আছেন, তাকে অবশ্যই দেখতে পাওয়া যায়—এই অন্ধবিশ্বাস হলো ডিলিউশন। ডিলিউশনের রোগী বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাদের ভ্রান্তবিশ্বাসে কোনো রকম যুক্তি-মুক্তচিত্তার ধার ধারে না। ডিলিউশন হওয়ার কারণ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা যায়—মস্তিষ্কের গতিময়তা কমে এলে উত্তেজিত স্নায়ুকোষগুলো অনড় অবস্থায় পৌঁছায়। উত্তেজনা ওই বিশেষ বিন্দুগুলোতে যেন অবস্থান-ধর্মঘট (Strike) পালন করতে শুরু করে। ফলে অনড় উত্তেজিতকোষগুলির আশেপাশের কোষগুলি মাত্রাধিক নিস্তেজিত হয়ে যায়। এই নিস্তেজনা যদি মস্তিষ্কের অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে তখনই ভ্রান্তধারণা পাকাপাকি মস্তিষ্কে গেঁথে যেতে পারে। কারণ উত্তেজিত বিন্দুগুলোর উত্তেজনা প্রায় স্থায়িত্বের আকার নেয়; মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ সুস্থ থাকায় যুক্তিবুদ্ধি সাধারণভাবে মস্তিষ্কে কাজ করে কিন্তু উত্তেজিত অংশে প্রভাব ফেলতে পারে না। ভ্রান্তধারণার সঙ্গে স্থায়ী শর্তাধীন পরাবর্ত^(৫) গড়ে ওঠার ফলে রোগীর নিজের ধারণা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এ ধরনের রোগীর মধ্যে অনেকটা বিশ্বাসে মেলায় বস্তু...'-ই সার কথা। ডিলিউশন কয়েক রকমের রয়েছে, যেমন:— (১) ডিলিউশন অব রেফারেন্স বা আত্মপ্রাসঙ্গিক ভ্রান্তি (২) ডিলিউশন অব পারসিকিউশন বা নির্যাতনমূলক ভ্রান্তি (৩) ডিলিউশন অব ইনফ্লুয়েন্স বা প্রভাবিতকরণ ভ্রান্তি (৪) ডিলিউশন অব গ্র্যান্ডিয়ার বা বিরাটত্বের ভ্রান্তি। ডিলিউশন অব রেফারেন্সের রোগী মনে করেন, আশেপাশের সব কিছুই তাকে কেন্দ্র করে ঘটছে। চেনা অচেনা সবাই তার দিকেই নজর রাখছে, তাকে নিয়ে আলোচনা করছে, তার কথা ভেবেই চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, তাকে নিয়ে উপহাস করার জন্য হাসাহাসি করছে—এমন সব তুচ্ছ ও সাধারণ ঘটনাকে অতিরঞ্জিত ও বিকৃত করে তার নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ভাবেন। ডিলিউশন অব পারসিকিউশনের রোগীর ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, সবাই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তাকে ভয় দেখাতে চাচ্ছে, তার ক্ষতি করার পরিকল্পনা করছে। মস্তিষ্কের নিস্তেজিত স্নায়ুকোষগুলো এই সময় অতিস্ববিরোধী পর্ব বা Ultraparadoxical phase-এ আসে। এই অবস্থায় ইতিবাচক উদ্দীপনায় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলোর বিকারগত অনড়ত্ব, তারপর অতিস্ববিরোধী এই দুটো ব্যাপার একসঙ্গে বা একটার পর একটা ঘটলে এই ডিলিউশনের উদ্ভব হয়। ডিলিউশন অব ইনফ্লুয়েন্স-এর রোগীরা মনে করেন, তাদের চিন্তা-অনুভূতি-কাজকর্ম বাইরের কোনো অদৃশ্য শক্তি/অলৌকিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে। তার নিজের ইচ্ছায় কোনো কিছু করছেন না। তারা মনে করেন, তারা অতিপ্রকৃত শক্তির প্রতিনিধি অথবা অবতার। ফলে তারা যা কিছুই করছেন, সবই ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত শক্তির ইচ্ছাতেই করছেন। ডিলিউশন অব গ্র্যান্ডিয়ারের রোগীদের বিরাটত্বের ভ্রান্তির লক্ষণ দেখা যায়। এই

রোগীরা নিজেদের বিষয়ে উচ্চ ধারণা ও বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন; এরা মনে করেন স্বয়ং ঈশ্বর বা ঐ জাতীয় অতিপ্রাকৃত শক্তির সাথে তাদের যোগাযোগ হয়েছে, এবং অতিপ্রাকৃত শক্তি তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে, তাদেরকে সমর্থন দিচ্ছে। বেশিরভাগ মহাপুরুষ বা অবতার নামধারীরা (রামকৃষ্ণ, লোকনাথ, যীশু, হযরত মোহাম্মদ, চৈতন্যদেব প্রমুখ) এই ডিলিউশনের শিকার। বিশেষ করে এখানে হিন্দুধর্মের মহাপুরুষ লোকনাথের নাম উল্লেখ করতে হয়; ভক্তদের কাছে তিনি ছিলেন শিবের অবতার, জীবিতকালে তাঁর শিষ্যদের প্রচণ্ড আত্মপ্রসিদ্ধি (কিংবা অহমিকা) নিয়ে বলতেন— "জলে-স্থলে-রণে-বনে-জঙ্গলে, যেখানেই বিপদে পড়িবে— আমাকে স্মরণ করিবে, আমিই তোমাদের রক্ষা করিব।" (বর্তমানকালের যেসকল ডাক্তার প্রাইভেট প্রেকটিস করেন, তাদের জন্য সুখবর, বাবা লোকনাথ আজ আর বেঁচে নেই, নয়তো—তিনি বেঁচে থাকলে প্রাইভেট ক্লিনিক, হাসপাতাল ইত্যাদি কতকিছুর ব্যবসা যে লাটে উটতো!) আবার মহাপুরুষদের মধ্যে কখনোবা ডিলিউশন অফ ইনফ্লুয়েন্স-এর উপসর্গ দেখা দিত। এ কথা বলার কারণ হচ্ছে, তাঁদের ধর্মপ্রচারের ইতিহাস দেখলে দেখা যায়, ধর্মপ্রচারের সময় প্রায়শ সোচ্চারে ঘোষণা দিতেন— "যা কিছুই করছেন স্বয়ং ঈশ্বরের নির্দেশেই করতেছেন।"^(৬) বেশিরভাগ মহাপুরুষরাই গভীর প্রত্যয় নিয়ে বিশ্বাস করতেন— ধ্যান, উপাসনার মধ্য দিয়ে সমাধিস্থ অবস্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব। ঈশ্বরদর্শনের তীব্র আকৃতিতে তাঁরা কঠোর ইন্দ্রিয় সংযম ও কৃচ্ছসাধন করতেন। এই কৃচ্ছসাধনের ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, আর এ থেকেই ওনারদের 'ঈশ্বর' নামক হ্যালুসিনেশন ঘটত^(৭)। আবার কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে লোক-ঠাকানোর জন্য, জনগণের কাছে নিজের ইমেজ বৃদ্ধির জন্য 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' খেলা চালিয়ে থাকেন, তবে আর বলার কিছু নেই। জানেনই তো ভুলোকের বেওসা করার জায়গা বা ফায়দা লোটোর কায়দার অভাব নেই!

প্যারানোইয়া (Paranoia) হলো 'বন্ধমূল ভ্রান্তিজনিত মস্তিষ্কবিকৃতি'। এই ধরনের রোগীর ভ্রান্ত ধারণা স্থায়ী ও অটল হয়। এটি ব্যক্তিত্বের রোগ। যদিও এর সাথে ডিলিউশনের বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। তবে তফাৎ হচ্ছে প্যারানোইয়া রোগীর মধ্যে ভ্রান্ত ধারণাটাই প্রধান, অন্য কোনো লক্ষণ বিশেষ কিছু থাকে না। ওনারা অন্ধ-ভ্রান্ত বিশ্বাসের বাইরে দৈনন্দিন জীবনে একদম স্বাভাবিক আচার-আচরণসহ যুক্তি-বুদ্ধি অনুসরণ করেন। তবে কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসচেতন থাকেন। প্যারানোইয়া রোগীদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এঁরা নিজেদের ভ্রান্তবিশ্বাসের পেছনে খুব সুন্দর করে যুক্তি খাড়া করতে চেষ্টা করেন, অলীক ধারণাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। যার ফলে আপাত দৃষ্টিতে এঁদের মানসিক রোগী বলেই মনে হয় না। যেমনটা করে থাকেন ডিলিউশন অফ ইনফ্লুয়েন্সের রোগীরা।

এখন ওই মানসিকঅসুখগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা যাক। হিস্টিরিয়া বা মূর্ছারোগ হচ্ছে একরকম নিউরোসিস্। এই রোগের কারণ হিসেবে ধরা হয়—অবদমিত মনের অবচেতন কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির চেষ্টা। সাধারণভাবে দেখা যায়—কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অল্পশিক্ষিত, শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত, বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা বা যুক্তির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ না পাওয়া ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে চিন্তার সহনশীলতা কম থাকে। এই শ্রেণির লোকেরা এক নাগাড়ে একই কথা শুনলে-ভাবলে-বললে, ওদের মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু কোষ বার বার উত্তেজিত হতে শুরু করে, আলোড়িত হতে থাকে। একসময় উত্তেজিত কোষগুলো একেজো হয়ে অন্য কোষগুলোর কাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে মস্তিষ্কের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এসময় এরা আবেগে চেতনা হারিয়ে ফেলে বা অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করে। এই রোগের বিশেষ কিছু লক্ষণ হচ্ছে— এক রঙকে অন্য রঙ বলে মনে হওয়া, এক বস্তুর জায়গায় দুটি দেখা (Double Vision), সম্পূর্ণ স্পর্শহীনতা বা আংশিক স্পর্শহীনতা দেখা দেয়া, বস্তুর স্থান নির্ণয়ে ভুল করা, হাতের আঙুল বা জিভের মৃদু কম্পন, বাকশক্তি রোধ হয়ে যাওয়া, সর্বশরীরে খিচুনি বা মৃদু সঞ্চালন, ফিট বা মূর্ছা

যাওয়া। এই ধরনের একাধিক লক্ষণ হিস্টেরিয়া রোগীর মধ্যে মূর্ছা যাবার সময় দেখা দিতে পারে। আমরা যাদের প্রচলিত ভাষায় 'ঈশ্বরে ভর', 'জিন-ভূতে ভর' করেছে বলে ধারণা করি, তাদের সিংহভাগই মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, হিস্টেরিয়ায় আক্রান্ত রোগী। এপিলেপ্সির রোগীরা এমনিতে ভালো থাকে তবে কিছুদিন পরপর তাদের মধ্যে এই রোগের আবির্ভাব ঘটে থাকে, তবে খুব কম সময়ের জন্যে রোগ-অবস্থা হয়ে থাকে, তারপরেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এই রোগ-অবস্থাকেই এপিলেপ্সির ফিট (Epileptic fit) বা খিঁচুনি বা তড়কাও বলা হয়। ফিট শুরু হবার সঙ্গেই রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় এবং সারা দেহের (চোখ, মুখ, বুক, পিঠ, পেট, হাত, পা) মাংশপেশীর প্রবল প্রক্ষেপ বা খিঁচুনি আরম্ভ হয়। ফিটের সময় দাঁতে দাঁত লেগে যেতে পারে এবং জিভে কামড় পড়তে পারে, মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়, কোনো কোনো সময় অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যায়। উল্লেখ করা যায় এপিলেপ্সির সাথে হিস্টেরিয়া রোগের কিছুটা পার্থক্য আছে, যেমন—এপিলেপ্সির ফিট সাধারণত ১ থেকে ২ মিনিট হয়, ফিটের সময় প্রথমে হাত-পা শক্ত হয়ে যায় এবং সারা শরীরে ঝাঁকুনি হতে থাকে, সবশেষে শরীর শিথিল হয়ে যায়, এই ফিটের সময় পুরোপুরি অজ্ঞান হয়ে যায়, প্রায় সময় ফিটের ঘটনাগুলি পর-পর ঘটে থাকে, ঘুমের মধ্যে অথবা জেগে থাকা অবস্থায় ফিট হতে পারে, এই রোগ স্ত্রী-পুরুষ অথবা যে কোনো বয়সের হতে পারে এবং মস্তিষ্কের শরীরভিত্তিক গোলযোগের ফলেই এই ফিট হয়। আর হিস্টেরিয়ার ফিট দীর্ঘস্থায়ী হয়, কোন নির্দিষ্ট সময়ে ফিট হয় না, প্রায় সময়ে এলোমেলো ভাবে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে, তবে পুরো অজ্ঞান থাকে না, রোগী অনেক সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে পারে। ঘুমের মধ্যে বা একা থাকলে ফিট হয় না, লোকজনের সামনেই ফিট হয়। কিশোরী এবং যুবতীদের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা যায় এবং এই রোগে মস্তিষ্কে শরীরভিত্তিক গোলযোগ দেখা যায় না। ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ (Maniac Depressive) হচ্ছে—মানসিক অবসাদ জনিত অসুখ। এ রোগের বেশিরভাগ রোগীই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, শিক্ষা, সহনশীলতা, যুক্তি, মুক্তবুদ্ধির সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ না পাওয়া মানুষ। এরা পারিবারিক জীবনে অসুখী, দায়িত্বভারে জর্জরিত এবং এর দরুন মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত। অসুখের সময় এদের স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনার ক্ষমতা কমে যায়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি (জোরে জোরে মাথা দোলানো, উচ্চস্বরে আবোল-তাবোল বলা, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করা ইত্যাদি) করে। এ ধরনের অসুখ দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। মাঝে মাঝে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেও পুনরায় আবার অসুখ ফিরে আসতে পারে।

আর স্কিটসোফ্রেনিয়া (কেউ কেউ একে সিজোফ্রেনিয়া বলে থাকেন) হচ্ছে প্রধানত চিন্তার রোগ (Disorder of thinking)। কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী লক্ষণগত কিছু মিল আছে এমন কয়েক ধরনের গুরুতর কঠিন মানসিক ব্যাধিকে একত্রে স্কিটসোফ্রেনিয়া বলে থাকেন। এখানে আগ্রহদীপক যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই রোগের শিকার হন আত্মস্থ ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারীরা (যারা চিন্তা করতে ভালবাসেন)। তারা কোনো কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে সঠিকভাবে চিন্তার মূলে পৌঁছাতে না পারলে বা বুঝতে গিয়ে ঠিক মত বুঝতে না পারলে, অথবা কোনো সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে সমাধানের পথ না পেলে অতি আবেগপ্রবণতার দরুন সমস্যা থেকে নিজেকে বের করে আনতে না পারলে তাদের মস্তিষ্কের গতিময়তা কমে যায়। তারা আরো বেশি করে নিজেদের চিন্তার মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। ফলে মস্তিষ্কের চালককেন্দ্র (motor centre) এবং সংবেদনকেন্দ্র (sensory area) ধীরে ধীরে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে, শ্লথ হতে থাকে, অনড় হতে থাকে। এর ফলে ঐ ব্যক্তির প্রথমে বাইরের কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে, তারপর নিজেদের পরিবারের আপনজন থেকে। একসময় নিজেদের সত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তখন রোগীর চিন্তা (Thought), আবেগ (Affect), প্রত্যক্ষণ (Perception), ইচ্ছাশক্তি (Will), এবং আচার-আচরণে (Behaviour) ঐক্যহীন বা অসঙ্গতি ধরা পড়ে। রোগী স্নান, আহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, শরীরের যত্ন নেয়া, লাজ-লজ্জার দিকে দৃষ্টি দেয়া—ইত্যাদি ব্যাপারে

একেবারেই উদাসীন হয়ে যায়। স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগীদের ইলিউশন, হ্যালুশিনেশন, ডিলিউশন প্রায়ই ঘটে থাকে। তবে বেশি ঘটে থাকে ডিলিউশন এবং হ্যালুশিনেশন (auditory hallucination)। যেসকল মুনি-ঋষি, মহাপুরুষ নামধারী স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগী আছেন, তাঁরা ডিলিউশন অব ইনফ্লুয়েন্স এবং ডিলিউশন অব গ্র্যান্ডিয়ার-এ বেশি ভোগেন^(৮)।

পাঠক, দীর্ঘ আলোচনার পর এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন—মহাপুরুষ, অবতার কখনোই শূণ্য থেকে সৃষ্টি হয় না। এঁদের গড়া হয়—শাসক-শোষক শ্রেণী, তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবী, প্রচারমাধ্যম, ভণ্ড-বুজুর্গের দল অবতার-মহাপুরুষদের কারিগর; আমরা সাধারণেরা তাঁদের প্ররোচনায় কী ভীষণ প্রতারিত হয়ে চলছি এতদিন! তাই তো ভারতের যুক্তিবাদী আন্দোলনের পুরোধা প্রবীর ঘোষ বলেন, "সকল মহাপুরুষ-অবতার এক একজন হয়তো মানসিক রোগী নয়তো ধাক্কাবাজ অভিনেতা।" এর থেকে বড় সত্য আর নেই।

(২) **অতীন্দ্রিয় অনুভূতি** : পার্শ্বিকজগতের দ্বিতীয় অপার্শ্বিক আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (Extra-Sensory Perception সংক্ষেপে E.S.P)। আমাদের চারপাশের সাধু-সন্ত-অবতার-অধাত্মবাদী-মহাপুরুষসহ বুজুর্গক-ভণ্ডের দল ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত অনুভূতির কথা বলে সুদূর অতীত থেকে বর্তমানে বেওসা করে আসছেন, অবাস্তব অলৌকিকত্বের স্বপক্ষে প্রচারণা চালিয়ে আসছেন। তাঁদের এ প্রচারণা অনেকসময় আমাদের মতো 'আধ-মরা'দের কাছে সত্য বলে মনে হয়; ধরাধামের ভিতরে-বাইরে অতিলৌকিকতার অস্তিত্ব রয়েছে বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি আর নবকলেবরধারী প্রচারকদের জগৎগুরু ভেবে মনপ্রাণ টেলে পূজা করি। পরামনোবিদ্যায় প্রচলিত আছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসমূহ হচ্ছে—(i) দূরচিন্তা (Telepathy) (ii) ভবিষ্যদৃষ্টি (Precognition) (iii) অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি (Clairvoyance) এবং (iv) জড়পদার্থে মানসিক শক্তি (Psychokinesis বা Pk)^(৯)। পাঠক, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে দেখে নিই এগুলো আসলে ঠিক কী। আমরা সবাই কম-বেশি দূরচিন্তার নাম শুনেছি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজি Telepathy শব্দটিই ব্যবহার করে থাকি। সাধারণভাবে এটি হচ্ছে দূর থেকে অন্য একজনের মনের কথা বা চিন্তাকে জানতে পারার ক্ষমতা। ভবিষ্যদৃষ্টি হচ্ছে ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা বলে দেয়ার ক্ষমতা, মানে আগামীকাল-পরশু অথবা আরো পরে কোনো নির্দিষ্ট দিন কী ঘটতে পারে—তা আগেভাগে বলতে পারার ক্ষমতাকেই ভবিষ্যদৃষ্টি বোঝায়। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি হচ্ছে দূরের কোনো জিনিষ দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা। যেমন:—আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি ঠিক এই মুহূর্তে কি করছেন, তা বলতে পারার ক্ষমতাকেই বোঝায়। আর মনোগতিশক্তি বা জড়পদার্থে মানসিক শক্তি—কোন জড়বস্তুর ক্ষমতাকে বোঝায়।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে কয়েকটি কথা বলে নিই। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান সবসময়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই কোন কিছু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে, বুঝে থাকে, গ্রহণ বা বর্জন করে থাকে। প্রযুক্তির প্রবল জোয়ারে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদণ্ডগুলি সর্বজনীন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দেখা যায়, ধর্মবাদিরা, অতিলৌকিকতার রক্ষকদেরা নিজেদের ভণ্ডমোকে এখন বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রচার করতে চান, বিজ্ঞানের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাকে অলৌকিকতা দিয়ে পূর্ণ করতে চান। কারণ কেন যেন জনগণ বাসি অলৌকিকতাকে আগের মত খায় না। অলৌকিকতার সাথে বিজ্ঞানের কিছুটা মিশ্রণ থাকলে আম-পাবলিক চেটেপুটে খায়। তাই ধরাধামের বিধাতারা আজকে ধর্মের (অপার্শ্বিকতার) সাথে বিজ্ঞানের খিচুরি পাকিয়ে জনগণের সামনে উপস্থাপন করে চলছেন অনবরত। আগেকার নির্ভেজাল 'যন্ত্র-মন্ত্র'-এর কার্যকারিতা ফুরিয়ে গেছে। যা হোক, ইদানীং এ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি নামধারী কুসংস্কারকে বিজ্ঞানের মোড়কে হাজির করা হচ্ছে, নাম দেয়া হয়েছে পরামনোবিদ্যা।^(১০) বিজ্ঞানের নাম ভাঙিয়ে অপবিজ্ঞানের চর্চার উদাহরণ তো

আর এ বিশ্বে কম নয়। এ উপমহাদেশের বহুল প্রচারিত ভয়ঙ্কর অপবিজ্ঞান জ্যোতিষবিদ্যার মতোই পরামনোবিদ্যা একটি নতুন সংযোজন মাত্র।

এবার মূল আলোচনাতে আসি। (i) দূরচিন্তা, নাম শুনেই বোঝা যায় বিষয়টা কী। পরামনোবিদ্যার ঝাঞ্জাধারী বিজ্ঞানী-মহাপুরুষ-পুরুতদের দীর্ঘদিনের তুরূপের তাস হল এই দূরচিন্তা। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, — আমরা যখন চিন্তা করি, তখন মস্তিষ্ক থেকে রেডিও তরঙ্গের মতো এক ধরনের তরঙ্গ প্রবাহিত হতে থাকে; দূরের কোনো লোকের পক্ষে তার মস্তিষ্কের সাহায্যে এই তরঙ্গকে ধরে প্রেরকের চিন্তার হৃদিস পাওয়া সম্ভব, যদিও কাজটা একটু কঠিন। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, শব্দ বা আলোক তরঙ্গ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক, গতি, মাত্রায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আমরা প্রয়োজন মত সেগুলো মাপতে পারি (যেমন, শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩৩২ মিটার আর আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল)। রেডিও-টেলিভিশন এই শব্দ-তরঙ্গ ও আলোক-তরঙ্গকে ধরে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে এবং পুনরায় আমাদের সামনে দৃশ্য ও শব্দ হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু 'চিন্তা' যে তরঙ্গ, এবং অন্য আরেক ব্যক্তির মস্তিষ্ক "গ্রাহকযন্ত্র" হিসেবে কাজ করতে পারে তা শুধু কল্পনাতেই রয়ে গেছে, বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি (পরামনোবিদ্যার ধারকেরা পর্যন্ত চিন্তা-তরঙ্গকে প্রমাণ করতে সক্ষম হননি)। তাই এই অস্তিত্বহীন চিন্তা-তরঙ্গকে ধরা এবং ভাব বুঝতে পারা নেহাতই অবাস্তব কল্পনা মাত্র। প্রাণির (বিশেষ করে মানুষের) মস্তিষ্কের একটি অংশ প্রিফ্রন্ট্যাল লোব (Prefrontal lobe), মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সাথে জটিল ও স্বাভাবিক যোগাযোগের মাধ্যমে, প্রাণির চিন্তা-বিচার-বুদ্ধি-মেধা ইত্যাদির বিকাশে কাজ করে থাকে এবং নিয়ন্ত্রণও করে থাকে। কিন্তু কোনো কারণে অপুষ্টি অথবা কোনো রোগের ফলে যদি এই অংশের অসম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে, তবে প্রাণির মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ নাও হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের মানসিক অস্বাভাবিকত্ব দেখা দিতে পারে। এই লোব থেকে চিন্তা কোনো ধরনের তরঙ্গ আকারে নির্গমন হচ্ছে— (এবং তাতে টেলিপ্যাথির কাজ হচ্ছে) বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করেননি, বা এই ধরনের কোনো দাবিও করেননি। তাছাড়া এই ধরনের তরঙ্গের অস্তিত্ব এক প্রকারে অসম্ভবও। স্নায়ুবিজ্ঞান বলে— শব্দশক্তি বা আলোকশক্তির মতো চিন্তা কোনো শক্তি নয়, ভেসে বেড়াবার বস্তু নয়— স্নায়ুক্রিয়ারই একটি ফল মাত্র। এরপরও কিছু ব্যক্তি (বিশেষ করে পরামনোবিদরা) বিভিন্ন সময়ে টেলিপ্যাথির সফল পরীক্ষা চালিয়েছেন বলে জোর গুজব রয়েছে। এ সকল গুজবের মধ্য থেকে একটি মাত্র উদাহরণ তুলে ধরছি এখানে— ১৯৫৯ সালের ২৫ জুলাই ড. জে বি রাইন দাবি করেন, তিনি টেলিপ্যাথির সাহায্যে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন 'ন্যাটিল্যাশ'-র খবর পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। এবং তাঁর এ পরীক্ষার সাথে যুক্ত ছিলেন আমেরিকার বিমানবাহিনীর সদস্য উইলিয়াম বাওয়ার। পরীক্ষার সময় ন্যাটিল্যাশ ছিল না-কি ১২০০ মাইল দূরে জলের তলায়। ড. রাইনের এ বক্তব্যের সত্যতা যাচাই-বাছাইয়ে সময় নষ্ট না করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলো পড়ি-মরি করে বাজাতে লাগল পরামনোবিদ্যার দিগ্বিজয়ের দামামা। সাধারণ মানুষ থেকে বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত সকলেই এ স্টান্ট নিউজের কবলে পড়ে বিভ্রান্ত হতে লাগলেন। কিন্তু সত্য তো আর বেশি দিন চাপা থাকে না। ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের *দিস উইক* পত্রিকার তরফ থেকে যখন টেলিপ্যাথির ওপর রিপোর্ট ছাপাতে তথ্য সংগ্রহ করতে গেল, তখনি বেড়িয়ে এল "কেঁচো খুঁড়তে সাপ"। ন্যাটিল্যাশ সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম অ্যান্ডারসন পরিষ্কার করে জানান, ১৯৫৯ সালের ২৫ জুলাই ন্যাটিল্যাশ ছিল ডকে, কিছু সারাইয়ের কাজ চলছিল। আর আজ পর্যন্ত টেলিপ্যাথির কোনো পরীক্ষা ন্যাটিল্যাশে চালানো হয়নি। এরপর *দিস উইক* পত্রিকাটি যখন টেলিপ্যাথির সঙ্গে যুক্ত বলে কথিত মার্কিন বিমান বাহিনীর উইলিয়াম বাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করল, তিনিও জানালেন— টেলিপ্যাথির কোনো পরীক্ষার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না এবং ৫৯ সালের ২৫ জুলাই তিনি ন্যাটিল্যাশে ছিলেন না, বরং ছিলেন বিমান বাহিনীর বিশ্ববিদ্যালয়ে। হায়রে দুনিয়া! চাপার জোর থাকলে যে, কত কিছুই করা সম্ভব, তারই নমুনা

এটি। টেলিপ্যাথি নিয়ে আরো প্রতারণামূলক খবর জানতে, আগ্রহীরা পড়ুন : প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক* (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪৯-১৭১। এবং ভবানী প্রসাদ সাহু, *ভূত ভগবান শয়তান বনাম ড. কোভুর*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২১-১২৬।

(ii) প্রায় সব ধর্মের অবতার, জ্যোতিষী, মহাপুরুষ ইত্যাদি লোকেরা ভবিষ্যদ্বৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে বলে জাহির করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করতে পারেনি যে ভবিষ্যদ্বৃষ্টি বলে কারো কোনো ক্ষমতা রয়েছে, বরং যারাই সাহস করে এই ক্ষমতার পরীক্ষা দিতে গেছে, তাদের বুজরুকি হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় কীভাবে এই বুজরুকির দল ভবিষ্যতের বক্তব্য বলে? আসলে বিষয়টি তেমন কিছুই না—পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী আর বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে কয়েক বছর পর কি ঘটতে পারে, তার একটা আভাস সবসময়ই পাওয়া যায় (বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক, কলাম লেখকেরা এরকম প্রতিনিয়তই করে আসছেন); কোনো কোনো সময় এই আভাস বা অনুমান সম্ভাব্যতার নিয়মে (Law of Possibility) মিলে যায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা মিলে না। পাঠক, আপনার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকান, এরকম ঘটনা প্রচুর খোঁজে পাবেন। প্রায়শঃই দেখা যায়, ধর্মীয়গুরু যখন কোনো বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেন এবং সেই বাণীটি ব্যর্থ হয় তখন আমরা ভুলে যাই, ধর্মীয়গুরুর ভুল হিসেবে স্বীকার করতে চাই না। কিন্তু কোনো কারণে যদি একবার ভবিষ্যদ্বাণীর কিঞ্চিৎ পরিমাণ মিলে যায়, তখন আমরা ঢাক-ঢোল নিয়ে বের হয়ে যাই গুরু-বন্দনা করতে করতে। অথচ নির্মোহ হয়ে হিসেব করলে দেখা যাবে, মহাপুরুষদের ভবিষ্যদ্বাণী (যা আপনি-আমি সঙ্কলেই কম-বেশি ধরি মাছ, না ছুঁই পানি—ধরনের বক্তব্য দিতে পারবো) বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়ার পরিমাণ বা মিলে যাওয়ার সংখ্যা থেকে না-মিলে যাওয়ার সংখ্যা হাজার হাজার গুণ বেশি। তবে গুরুর প্রতি আমাদের অন্ধভক্তি-বিশ্বাস উবে গেলে, পাপে নিমজ্জিত হওয়া ও পরকালে নরক যাওয়ার ভয়ে না-মিলা ঘটনাগুলো কাউকে বলি না; চাপা দেই নিজের স্মৃতিভাণ্ডারে। এখানে প্রাসঙ্গিক যে, উপমহাদেশের যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ ড. আব্রাহাম থোম্মা কোভুর আমাদের জানিয়েছেন—একজন সফল (ধুরন্ধর) ধর্মগুরু/অবতার/পয়গম্বর/পিরবাবা হওয়ার জন্য কী কী গুণ/কৌশলের প্রয়োজন^(১১);—**প্রথমত**, প্রয়োজন কিছু অর্থহীন গালভরা বুলি উপযুক্ত দক্ষতার সঙ্গে ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে তোতাপাখির মত আউরে যাওয়ার ক্ষমতা—যেমন, আত্মমুক্তি, আত্মারশুদ্ধি, আত্মোপলব্ধি, ত্যাগ, তিতিক্ষা, পরমপ্রাপ্তি, দৈবশক্তি, অতীন্দ্রিয় মানস, কর্মযোগ, মোক্ষ, নির্বাণ ইত্যাদি। **দ্বিতীয়ত**, ম্যাজিসিয়ানসুলভ কয়েকটি লোক ঠকানো কৌশল আয়ত্ত করা; যেমন শূণ্যে হাত নেড়ে ফুল, সুগন্ধিযুক্ত ছাই, সন্দেশ বের করা, নিজের নাড়ী 'বন্ধ' করে দেওয়া, কারো পোশাকের ভিতরে কি আছে অথবা বাড়িতে কি ঘটেছে তা আচমকা বলে দিয়ে চমকে দেওয়া ইত্যাদি। পাশাপাশি এসবের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত বা উদাস চাউনি, এলোমেলো পোশাক, পাগল-পাগল ভাব, কিছু অস্বাভাবিক আচরণ যেমন নিজের মল-মূত্র খেয়ে ফেলা বা এই ধরনের অস্বাভাবিক কোনো কিছু, আর কথাবার্তার মধ্যে যদি আকর্ষণীয় উপস্থাপনভঙ্গি থাকলে তো আর কথাই নেই! **তৃতীয়ত**, যা সবচেয়ে দরকারী তা হল কিছু প্রচারক দালাল। এরা ঐ ধর্মগুরু/অবতার/পয়গম্বরের মাহাত্ম্য সম্পর্কে নিজের ও অন্যদের (অর্ধসত্য-সম্পূর্ণ মিথ্যা) অভিজ্ঞতার কথা মুখে-মুখে, সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশন ইত্যাদি প্রচারযন্ত্রে, তাদের গল্প-কবিতা-উপন্যাস ইত্যাদি 'সাহিত্য-কীর্তির' মাধ্যমে রগরগে ভঙ্গিমায় প্রচার করবে। একাজ করার জন্য কখনো তাদের সাথে আর্থিক ভাগবাঁটোয়ারার চুক্তি করতে হবে অথবা কৌশলী আচরণে ওদের মধ্যেও সরল-নির্বোধ বিশ্বাস জন্মাতে হবে (অর্থাৎ পটাতে হবে)। **চতুর্থত**, প্রয়োজন বিপুল সংখ্যক সরল-বোকা-অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত-যুক্তিবুদ্ধিহীন-অসহায়-নির্বোধ ধর্মবিশ্বাসীর দল। যারা প্রণামী, নৈবদ্য ও সরল বিশ্বাস নিয়ে পয়গম্বর/অবতার/পিরবাবার ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলবে নির্দিধায়। আমাদের চারপাশের গরীব দেশগুলিতে এরকম অসহায় লোকের তো অভাব নেই বরং ওদের সংখ্যাই বেশি। ড.

কোভুরের সাথে একমত পোষণ করে ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু আরেকটি কৌশলের কথা বলেছেন; তিনি বলেন— **পঞ্চমত**, অবতার/পয়গম্বর/পিরবাবার লোকঠকানো ধর্মব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থের কিয়দংশ স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল ইত্যাদি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কাজে অথবা দুর্যোগ পীড়িত সাধারণ মানুষের ত্রাণকার্যে ব্যবহার করতে হবে। এতে করে বিপুল পরিমাণ সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের আস্থা, সম্মান, সহানুভূতি, সম্মম আদায় হয়; যা ঐ ধর্মব্যবসা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে অত্যাবশ্যকীয়। আশা করি পাঠকের চারপাশে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মিশনারি কাজকারবার দেখে উদাহরণের অভাব হবে না। আর আমাদের (বিশেষ করে বাঙালিদের মধ্যে) একটি মারাত্মক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গুজবে কান দেয়া^(১২); মূল ঘটনা কী, সেটা ভালোভাবে খোঁজ-খবর না করে "যাহা রটে তা কিছু কিছু বটে"—ধরে নিয়ে "চিলের পিছনে" ছুটতে থাকি। আমাদের এই ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত প্রপাগান্ডায় সম্পূর্ণ মিথ্যার বেসাতি দ্বারা তৈরি অলৌকিকতার প্রচার হয়, আর সাধারণ লোকে "বেশি লোক বলাবলি করছে দেখে"—বিশ্বাস করে, সত্যি বলে ধরে নেয়।

এখন আমরা দেখি, কী করে একজনের মুখ দেখে তার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা যায়^(১৩); অনেক সময় তা প্রায় মিলেও যায়। এ কাজটি সবচেয়ে বেশি করে থাকেন ধর্মগুরু/জ্যোতিষি/পিরবাবা/পয়গম্বর ইত্যাদি কিসিমের লোকেরা। প্রথমেই স্পষ্ট করে বলে নিই, —ওঁদের এই বলার মধ্যে নেই কোনো অলীক ক্ষমতা, স্রেফ আছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, মানুষকে যাচাই করার ক্ষমতা, আর উপস্থিত বুদ্ধি। তো এবার একজন ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ করা যাক;—যার সম্পর্কে বলবেন, তার মধ্যে সর্বপ্রথম আপনার প্রতি আস্থা জন্মাতে হবে, এজন্য কিছু (প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক) ভালো ভালো কথা সুন্দর করে গুছিয়ে উপস্থাপন করতে হবে (কখনোই জটিল কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ শুরু করবেন না), পাশাপাশি কৌশলে ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মক্ষেত্র, পরিবারের অবস্থা, বিবাহিত না অবিবাহিত, পছন্দনীয় বিষয়, শখ ইত্যাদি জেনে নিতে হবে (সবকিছু না জানলেও ক্ষতি নেই), পরিমিত মাত্রায় হাসতে হবে, ব্যক্তির মনযোগ আপনার প্রতি নিবদ্ধ করার জন্য এগুলো করতে হবে এবং ব্যক্তির চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে। ব্যক্তি যদি গড়-মধ্যবিত্ত ধরনের বলে মনে হয় (অর্থাৎ পোশাক, চেহারা, চুলের স্টাইল ইত্যাদি দেখে এরকমই লাগে), তবে তাকে এভাবে বলুন:— "আপনার মানুষ চেনার ক্ষমতা সহজাত, আপনি সবার জন্যই কিছু করতে চান বিশেষ করে আপনার পরিবারের জন্য; এবং আপনি সুযোগ মত করেনও, তবে এর বিনিময়ে তাঁদের কাছ থেকে আশানুরূপ কৃতজ্ঞতা-অভিনন্দন পান না এবং পাবেন না। কর্মক্ষেত্রেও আপনার একই অবস্থা; প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বারে বারে বঞ্চিত হচ্ছেন। আপনার বন্ধুদের মধ্যে শুভার্থী যেমন আছেন, তেমনি ঈর্ষাপরায়ণও কেউ কেউ আছেন। তাদের কাছ থেকে আপনাকে সাবধান থাকতে হবে। আপনি বহু অর্থ সমস্যাতে নানা সময়ে ভুগেছেন এবং শেষ পর্যন্ত উদ্ধারও পেয়েছেন। আপনার বিভিন্ন বিপদে প্রত্যাশিত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রত্যাশিত পরিমাণ সাহায্য পান নাই বরং অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিও আপনাকে সাহায্য করেছেন এবং আগামীতে করবেনও।" আমাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—অন্যের মুখ থেকে প্রশংসা শুনলে আমরা খুশি হয়ে উঠি; এই প্রশংসার বিষয় সত্যি না হলেও কিছু যায় আসে না, আমাদের ক্ষেত্রে তা সত্যি বলে ধরে নিই। "সংসারের জন্য, কর্মক্ষেত্রের জন্য যতই করুন না কেন, যতটা সম্মান আপনার প্রাপ্য ততটা পাচ্ছেন না"—এই ধরনের কথাটা শুনতে নারী-পুরুষ সকলেই ভালোবাসে এবং সবসময় মনে করে সে প্রাপ্য সম্মানের কিছু কম পাচ্ছে কিংবা তার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না ইত্যাদি। আর মধ্যবিত্ত রোজগারি ব্যক্তি যে নানা সময়ে আর্থিক সমস্যাতে পড়বেই এবং উৎক্লান্ত হবে, সেটা বলাই বাহুল্য। আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি, বিপদে পড়লে অনেক সময় নিকট পরিচিত/কাছের বন্ধু পিছুটান দেয় এবং অর্ধপরিচিত ব্যক্তি বা বন্ধু এগিয়ে আসে। এটা সবার ক্ষেত্রে কম-বেশি ঘটে থাকে। শিক্ষিত, সুন্দরী নারী সম্পর্কে বলতে হলে নির্দিধায় বলতে পারেন— "আপনার কাছে অনেকেই প্রেম নিবেদন করেছেন এবং বেশিরভাগকে আপনার

যোগ্য বা পছন্দ হয়নি।" কিংবা একটু ঘুরিয়ে বলতে পারেন, "আপনার গুণমুগ্ধ পুরুষের সংখ্যা অনেক।" বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় শিক্ষিত-অধশিক্ষিত-অশিক্ষিত, সুন্দরী-অধসুন্দরী নারীর জীবনে একাধিক পুরুষের আবির্ভাব প্রায় ধ্রুবসত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষদের দেখেও এরকম প্রেমের কথা বলে দেয়া সম্ভব; সুদর্শন, স্মার্ট, বাকপটু কিংবা লোফার মার্কা ছেলেদের জীবনেও একাধিক নারী আসাটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

যাঁকে দেখে রাগী বলে অনুমান করবেন, তাঁর সম্পর্কে বলতে পারেন, — "আপনি সাধারণতঃ সহজ-সরল পথে চলতে ভালোবাসেন, কিন্তু প্রয়োজনে বাঁকা পথও ধরতে পারেন। আপনি রেগে গেলে সাংঘাতিক হয়ে ওঠেন কিন্তু কখনোই বুদ্ধির বিভ্রম ঘটে না।" দেখবেন যাঁর সম্পর্কে বলেছেন, খুশিতে তিনি একদম বাক-বাকম হয়ে যাবেন, তখন আপনি গুণমুগ্ধ শ্রোতার চোখে, শ্রোতার প্রচারে অন্যদের চোখেও হয়ে উঠবেন দারুণ ভবিষ্যদ্বক্তা। আসলে তোষামোদে সকলেই খুশি হয়, নিজের সম্বন্ধে ভালো কথা শুনলে মনের মধ্যে খুশির জোয়ার চলে আসে এবং না-মেলা কথাগুলো একদমই ভুলে যাই। আবার ব্যক্তি যদি ধনী হন (অর্থাৎ পোষাক-পরিচ্ছদ, চেহারা, গলায় চেন, হাতে আঙুটি ইত্যাদি দেখে মনে হলে), তবে বলুন, "আপনার মানুষ চেনার ক্ষমতা অসাধারণ, আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা। অনেকে আপনাকে ঈর্ষা করে এবং অনেকেই আপনাকে শ্রদ্ধা করে। অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন সহজেই। জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মোকাবেলা করেছেন, এমনিতে মানুষের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক আছে কিন্তু প্রয়োজনে রুঢ় হতেও জানেন। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে, প্রায়ই বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় না, তবে নিত্য নতুন বন্ধুর আগমন হয়। ইত্যাদি।" ধনীব্যক্তি ব্যবসায়ী হলে (সবার জীবনেই কম-বেশি) তো লাভ-লোকসান আছেই অর্থাৎ ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা করতেই হবে। এছাড়া ব্যবসায়ী ব্যক্তি কিংবা রাজনীতিবিদকে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করতেই হবে, এবং এক ধাপ উত্তরণের সঙ্গেই পুরানো অনেকেই বিদায় নেন। ধনীব্যক্তিকে অনেকে (বিশেষ করে গরীব আত্মীয়-স্বজনেরা) ভয় পেয়ে শ্রদ্ধা করে আর প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক ধনী ঈর্ষা করতেই পারে।

এভাবে মানুষের নানা শ্রেণিবন্যাসের ওপর নির্ভর করে এমনি কত কিছুই যে ঠিক-ঠাক বলে দেওয়া যায়, সে নিয়ে একটা মহাভারত রচনা করা যাবে। আমাদের আশেপাশের ভণ্ড-বুজরুক জ্যোতিষী/পির/মহাপুরুষ কথিত অলীক কারসাজি ব্যতিরেকে এরকমই মনুষ্যচরিত্র বুঝে বা আন্দাজ করে নানা বক্তব্য দিয়ে থাকে। যা অনেক ক্ষেত্রে মিলে যায়, অনেক ক্ষেত্রে যায় না। না মিললে বয়েই গেল। যাদের মেলে, প্রচার তো তারাই করে। অতএব "মা ভৈ"! কিন্তু আপনি যদি কোনো জ্যোতিষী/পির/মহাপুরুষকে কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন নির্দিষ্ট করে উত্তর দিতে, যেমন— বিখ্যাত জীবিত অমুক ঠিক কোন্ দিন মারা যাবে, অমুকের সাথে কার বিয়ে হবে, কতটি সন্তান হবে, অমুকের ব্যাঙ্ক একাউন্টে ঠিক কতো টাকা আছে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করেন (যদি ইনফরমার মারফত জানার সুযোগ না থাকে), তবে দেখবেন ঐ জ্যোতিষী/পির/মহাপুরুষ নির্ঘাত পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইবেন না; আর বেশি চাপাচাপি করলে চালাকি করে এমন ভাসাভাসা উত্তর দিবেন যে— মিলতেও পারে আবার নাও মিলতে পারে।

(iii) অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দাবিদারদের মতে, ক্লেয়ারভয়ান্স (Clairvoyance) শক্তির সাহায্যে বহু দূরের ঘটনা দেখা ও শোনা সম্ভব। প্রায়ই বিভিন্ন পির/মহাপুরুষেরা এমনিটা দাবি করে থাকেন তাদের ভক্তদের কাছে। পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্য প্রবীর ঘোষের বই^(১৪) থেকে একটি ছোট্ট উদাহরণ তুলে ধরছি;— কলকাতার এক প্রবীণ সাংবাদিক এক বাঙালি তান্ত্রিকের পরম ভক্ত। ঐ সাংবাদিক বিদেশে একবার অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কয়েকদিন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ফিরে এসে ঐ সাংবাদিক

যখন তাঁর গুরুর কাছে ঘটনাটি বললেন, তিনি বললেন, "ওরে সে আমি দেখেছি। তোর ঘরে যে নার্স মেয়েটি ফুল রেখে যেত, সে বড় ভালোরে।" তান্ত্রিকবাবার ঐ এক কথাতেই বাজিমাৎ। সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ সাংবাদিক বিশ্বাস করে ফেললেন, তান্ত্রিকবাবার নির্ঘাত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে। নয়তো গুরুজী বললেন কীভাবে, সাংবাদিকের কেবিনে রোজ নার্স ফুল রেখে যেত, সে বড় ভালো। আসলে ঐ সাংবাদিকের মধ্যে গুরুভক্তি এতোই প্রবল ছিল যে, গুরুর মুখ থেকে শোনার পর তাঁর মধ্যে আর যুক্তিবোধ কাজ করেনি। তিনি গুরুর কথাকেই পরমসত্য (Absolute truth) বলে ধরে নিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিকমান সম্পন্ন যে কোনো হাসপাতালের কেবিনের ফুলদানিতে ফুল থাকে, আর নার্সের কাজ তো রোগীদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা করা—এটুকুই জানা থাকলেই যে এ ধরনের কথা বলা যায়, তা ঐ সাংবাদিকের মতো অন্ধবিশ্বাসীকে কে বোঝাবে? আবার ধরুন, আপনি বা আমি অন্য একজন ব্যক্তি সম্পর্কে মোটামুটি জানি, যেমন, — ঐ লোকটি কখন-কোথায় যাতায়াত করেন, রাতে কখন ঘুমাতে যান, কী ধরনের খাবার পছন্দ করেন, কী ধরনের পোষাক পড়তে ভালোবাসেন, কী ধরনের বই পড়েন, কখন পড়েন, কার-কার সাথে ভালো সম্পর্ক আছে, কার-কার সাথে খারাপ সম্পর্ক আছে, অবসর পেলে তিনি সাধারণত কী করেন, পরিবারে কে-কে আছে, তাঁরা কী করেন ইত্যাদি। তাহলে, আমরাও সময়-সুযোগমতো ঐ লোকটি সম্পর্কে এমন কিছু বলে দিতে পারবো, যা সত্যিই মিলে যাবে; অথবা উপস্থিত সময়ে আচরণ বিশ্লেষণ করেও কিছু-কিছু বলে দেয়া সম্ভব, যা মিলে যেতে পারে। আর ঐ লোকটির মধ্যে যদি অলৌকিকতার প্রতি গভীর বিশ্বাস থাকে, তবে তো তিনি নির্ঘাত ধরে নিবেন—আমাদের মধ্যে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে! বন্ধু-বান্ধবের সাথে স্নেহ মশকারা করার জন্য (অলৌকিকতা প্রচারের জন্য নয়) এরকম খেলা আমরা সবাই কম-বেশি করেছি নানা সময়। দেখছি—সবচেয়ে ভালো হয়, খুব কাছের বন্ধুকে এরকম খেলা না দেখিয়ে (কারণ সেও আপনার সম্পর্কে কম-বেশি জানে, ফলে ঐ বন্ধুকে আর বিস্মিত করা যাবে না) একটু অল্প-অর্ধ পরিচিত লোক সম্পর্কে আগেই অন্য কারো (অন্য বন্ধু-বান্ধব) মারফত জেনে নিয়ে, ঐ অল্প-অর্ধ পরিচিতের সামনে ছট-হাট বলে দিলে তাঁর আর বিস্ময়ের সীমা থাকে না; তখন খেলাটা জমে ভালো।

আসলে ঐ টেলিপ্যাথিই বলেন, ভবিষ্যদ্বাণীই বলেন আর অতীন্দ্রিয়দৃষ্টিই বলেন, এই সকল তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় যারা দেয় বা দাবি করে, তারা নিজেদের বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান, বিশ্লেষণ এবং মাঝে মাঝে কিছু লৌকিক কৌশল প্রয়োগ করে বলে মাত্র—এগুলির কয়েকটি মিলেও যেতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটির মধ্যে বিন্দুমাত্র ঐশ্বরিক কোনো ক্ষমতা নেই। সত্যি কথা হচ্ছে, আমরা সাধারণ জনগণ "মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ-উপস্থিত বুদ্ধি খাটুনির কৌশল" জানি না বলেই, অন্যের মুখ থেকে নিজের সম্পর্কে দু-একটা বক্তব্য মিলে গেলে ধান্দায় পড়ে যাই। তা পাঠক, এই যে লৌকিক কৌশলের কথা বললাম সেটা কী; এটা হচ্ছে আশেপাশের ম্যাজিসিয়ানরা সচরাচর দর্শকদের জাদু দেখিয়ে তুষ্ট করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করে থাকে, সেটাই। একটা উদাহরণ দেই,—প্রচলিত আছে, ইজারাইলি বিমান বাহিনীর সাবেক সদস্য, বর্তমানে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার ঝাঙাধারী ইউরি গেলার এবং তাঁর গডফাদার ডক্টর আন্ড্রিজা পুহারিচ না-কি অনেক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে এসে সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে তাঁদের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির প্রমাণ দিয়ে গেছেন! শোনা যায় ইউরি গেলার সীল দিয়ে বন্ধ করা একটা মোটা খামের ভিতর রাখা ছবির বর্ণনা প্রতিবারই সঠিক দিয়েছেন। খামটিকে এমন পুরণ করে রাখা হয়েছিল যাতে তীব্র আলোর সামনে খামটিকে ধরলেও ভিতরের ছবি ফুটে না ওঠে। চমকে যাওয়ার মতো বিষয়, কীভাবে সম্ভব। কিন্তু ম্যাজিসিয়ানদের কাছে ঐ বিষয়টি আসলে কিছুই না। গেলার যা করতেন তা হলো, দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে সীল করা খামটি ডুবিয়ে দিতেন অ্যাবসিলিউট অ্যালকোহল বা রিফাইন্ড স্পিরিটে। এতে সামান্য সময়ের জন্য খামটা স্বচ্ছ হয়ে যায়, এবং ভেতরের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দর্শকদের চোখের আড়ালে খামের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিলেই হয় তখন। তারপর একটু সময় পর যখন ঐ অ্যাবসিলিউট অ্যালকোহল

বা রিফাইন্ড স্পিরিট উবে গিয়ে আবার অস্বচ্ছ হয়ে গেল তখন অলৌকিক কোনো কাজ করছি এমন একটা "ভাব" নিয়ে খামের ভিতরে রাখা ছবির বর্ণনা দিতেন। ব্যাস। আবার ইউরি গেলারের ম্যানেজার Yasha Katz গোপন খবর ফাঁস করে দিয়ে জানিয়েছেন, আগের পদ্ধতিটি ঠিক মতো ব্যবহার করা সম্ভব না হলে, এই Katz-ই কৌশলে গোপন খামগুলো খুলে তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অনুষ্ঠানের আগেই গেলারকে জানিয়ে রাখতেন। এরপর অনুষ্ঠান শুরুর পর গেলার ভাব নিয়ে ছবির বর্ণনা দিতেন।

(iv) লোকমুখে প্রচলিত আছে, মানসিক বা চিন্তাশক্তির "অলৌকিক" ক্ষমতার মাধ্যমে কোনো জড়বস্তুকে স্থির কিংবা গতিশীল করা, কোনো ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা কোনো বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করা যায়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও রয়েছে এ নিয়ে নানা নিশান আর সাথে-সাথে বিভিন্ন মহাপুরুষ/পিরের জীবনীতেও জড়িয়ে রোমাঞ্চকর সব ঘটনার কথা। বিশেষ করে মানসিক শক্তি দিয়ে রেলগাড়ি আটকে দেয়ার 'গপ্পো' অনেকের কাছেই বোধহয় নতুন নয়। মনে আছে ছোটবেলায় ভারতের এক মহাপুরুষের জীবনী নিয়ে তৈরি এক বাংলা সিনেমাতেও এরকম ঘটনা দেখেছি। তখন বিষয়টি বিশ্বাসও করে ফেলেছিলাম। ভাবতাম, সাধু-সন্ন্যাসী-পিরদের নিশ্চয়ই এরকম নানা অলৌকিক ক্ষমতা আছে। বিশেষ করে, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এরকম প্রচুর সাধু-সন্ন্যাসীর বর্ণনা আছে, মানসিক শক্তির দ্বারা তাঁরা যখন খুশি-যেখানে খুশি চলে যেতে পারেন, যাকে খুশি ইচ্ছেমত শরীরের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারতেন। যেমন— পদ্মপুরাণে আছে মুনি গৌতম একবার বাহির থেকে এসে দেখলেন, তাঁর স্ত্রী অহল্যা আর দেবরাজ ইন্দ্র ফষ্টিনষ্টি আর রমণে লিপ্ত। মুনি গৌতমের সহ্য হল না; তিনি অভিশাপ দিলেন, অহল্যা পাথর হয়ে গেল আর দেবরাজ ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে হাজারটি ভগ (যোনি) উৎপন্ন হল! এজন্যই হয়তো হিন্দুরা ইন্দ্রকে "ভগবান" বলে থাকে!; আবার আরেক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত আছে তাঁদের ধর্মের শেষ মহাপুরুষ একবার বিধর্মীর কাছে নিজের প্রচারিত ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আঙুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিলেন! যাহোক— আধুনিককালে বিজ্ঞানের পরিচিত শক্তিগুলোর মধ্যে আছে বিদ্যুৎ শক্তি, চৌম্বক শক্তি, শব্দ শক্তি, আলোক শক্তি ইত্যাদি। এগুলোকে আমরা দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে আসছি। কিন্তু অদ্যাপি মানসিক শক্তি বা চিন্তা শক্তির খোঁজ বিজ্ঞানের জানা নেই; সহজ কথা হচ্ছে বিজ্ঞান এর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। অর্থাৎ বিজ্ঞানের অন্যান্য শক্তির মতো চিন্তাশক্তির মাধ্যমে আমরা বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে পারব না, পারব না বৈদ্যুতিক ফ্যান চালাতে, পারবো না কোনো মোটরগাড়ি-সাইকেল থামাতে বা চালাতে, সম্ভব নয়—একটি চামচ বাঁকিয়ে দেয়া, একটি গাড়িকে শূন্যে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেয়া ইত্যাদি। আগেই উল্লেখ করেছি, চিন্তা হলো প্রাণির মস্তিষ্কের স্নায়ুক্রিয়ার ফল। এবং এই স্নায়ুক্রিয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র স্বদেহেরই রক্তের চাপ বাড়তে পারে-কমতে পারে, মাথা গরম হতে পারে, হজমে গোলমাল হতে পারে, হাঁপানি বেড়ে যেতে পারে-কমতে পারে, দাঁতের ব্যথা, আলসার হতে পারে, ঘুম কম-বেশি হতে পারে, ক্ষুধামান্দ্য দেখা দিতে পারে ইত্যাদি। আর এগুলো হওয়ার কারণ হচ্ছে,—এ বিষয়গুলি সরাসরি আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ স্নায়ুতন্ত্রের জটিল গঠন-ব্যাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোনোভাবেই শরীরের বাইরে কোনো কিছুকেই চিন্তাশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; কারণ এটি শরীরের বাইরে প্রবাহিত হয় না। অধুনা বিভিন্নজনের সম্পর্কে শোনা যায়, তারা না-কি এই মানসিক বা চিন্তাশক্তি দিয়ে ধাতব চামচ বাঁকিয়ে দিয়েছেন, চলন্ত ট্রেন থামিয়ে দিয়েছেন, কেবল-কার থামিয়ে দিয়েছেন, লিফট থামিয়ে দিয়েছেন, চলন্ত স্টিমারও থামিয়ে দিয়েছেন। এগুলো করা হয়েছে মূলত আরো আট-দশটা ম্যাজিসিয়ানসুলভ কারসাজি দিয়ে; এর বেশি কিছু না। যেমন:—ভারতের বিখ্যাত জাদুসম্রাট পি সি সরকার একবার নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ যাওয়ার জন্য স্টিমারে করে যাচ্ছিলেন। পথে স্টিমারের যাত্রীদের সস্তা বিনোদনের জন্য কিংবা তাজ্জব করার উদ্দেশ্যে মাঝনদীতে স্টিমার থামিয়ে দিলেন। দর্শকেরা দেখলো জাদুসম্রাট সরকার কুস্তক যোগের মাধ্যমে মানসিকশক্তি প্রয়োগ করে স্টিমার থামিয়ে দিয়েছেন। জাদুকরের

এহেন অতীন্দ্রিয় কীর্তি দেখে চারিদিকে হেঁচো পড়ে গেল, অবাক দর্শক ঘন হাতাহালি দিতে লাগল। কথা হচ্ছে অতীন্দ্রিয় কীর্তি-টার্টি কিছুই নয়, জাদুসম্মাটের ক্ষমতার চাবিকাঠি ছিল স্টিমারের সারেঙের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। যাত্রীদের সাথে মজা করার উদ্দেশ্যে জাদুকর আগেই স্টিমারের সারেঙদের সাথে আলাপ করে কৌশল ঠিক করে নিয়েছিলেন, তারপর তো সেই কৌশল অনুযায়ী কাজ। তাও তো ভালো, জাদুকরের এমন কাণ্ডকে যাত্রীরা শুধু সস্তা বিনোদন হিসেবে নিয়েছে, কোনো অলৌকিক মহাপুরুষের কীর্তি হিসেবে নেয়নি, নয়তো আরেকটি কুসংস্কারের চারা রূপিত হতো যাত্রীদের মনে। ঠিক এমনিভাবেই যাদের সম্পর্কে শোনা যায় ট্রেন আটিকে দিয়েছে মানসিকশক্তির প্রয়োগ করে, তারা এগুলো করে থাকেন আগে থেকে ড্রাইভার ও তার সাগরেদের সাথে চুক্তির মাধ্যমে। এতে দুপক্ষেরই লাভ। গুরুজির অলৌকিক কীর্তি প্রচারিত হলে তাঁর ভক্ত সংখ্যা বাড়বে, প্রণামী বাড়বে আর ড্রাইভার ও সাগরেদরা এই ফাঁকে গুরু কাছ থেকে দুপয়সা কামাতে পারবে। তেমনিভাবে বিখ্যাত (?) পরামনোবিদ ইউরি গেলারের "অতীন্দ্রিয় মানসিক বা চিন্তাশক্তি"-র মাধ্যমে লিফট, কেবল-কার থামিয়ে দেয়া, অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে দর্শকদের সাথে নাটক করা হতো। আর গেলারের কুকীর্তিগুলি ইউরোপ-আমেরিকার পত্র-পত্রিকা, টিভি মিডিয়ার সাংবাদিকেরা অতীন্দ্রিয়তার নাম ভাঙিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে পরিবেশন করতো। তবে আমাদের জন্য সুখবর, সত্যানুসন্ধানী ম্যাজিসিয়ান জেমস র্যান্ডি "দি ম্যাজিক অব ইউরি গেলার" নামক একটি বই লিখে গেলারের হাতে হাড়ি ভেঙে দিয়েছেন। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, ইউরি গেলার যেসব কাজ করে দেখাতেন এবং অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার পরিচয় হিসেবে জাহির করতেন, সেগুলি আসলে ছিল ম্যাজিসিয়ানসুলভ চাতুরী মাত্র; এবং এই বইয়ে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যা হোক, বাজার অর্থনীতির এ যুগে খবর যখন নেহাতই পণ্য, তখন মাঠের গরু যদি প্রচারের দৌলতে গাছে চড়ে বসে তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

পাঠক, এবার প্রবন্ধটি গুটিয়ে নেয়ার পালা; কী বুঝলেন। অতীন্দ্রিয়তা-অলৌকিকতা-অপার্শ্বিকতা যা-ই বলি না কেন, তা সম্পূর্ণটাই সাজানো, কৃত্রিম, লোকদেখানো অভিনয় অথবা মানসিক ভারসাম্যহীনদের কাজকারবার। ক্ষমতাবানরাই নিজেদের কেদারা সুরক্ষিত রাখার স্বার্থে সময়ে-সময়ে আমাদের মস্তিষ্কে ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্ম, অতীন্দ্রিয়তার বাণী গেঁথে দেয়; এবং আপনার-আমার চারপাশের লোকেরাই সস্তাপ্রচারের মোহে, নিজেদের লাভের জন্য, শ্রেণিশোষণ টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই এ ভণ্ডামো-বুজরুকি কাজ করে আসছে যুগ-যুগ ধরে। এরাই সমাজের খ্যাতিমান, এলিট শ্রেণির সদস্য; চলনে-বলনে-ভোগে তারা অগ্রগণ্য আর ত্যাগে পশ্চাদসারিতে। কিন্তু জানি, এটাই শেষ কথা নয়, শেষ কথা বলবে জনগণ। তবে তার আগে এ ভণ্ডদের দীর্ঘদিনের সেবাপরায়ণতার-পবিত্রতার-নৈতিকতার-পাপ-পুণ্যের-পারলৌকিকতার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলতে হবে আপনাকে-আমাকে সর্ব্বাইকে^(১৫)।

তথ্যসূত্র :

(১) জন্মের পর থেকেই বুঝে না-বুঝে ঈশ্বরে-ধর্মে বিশ্বাসীরা রোজ কতবার যে হাতজোড় করে প্রার্থনা করে থাকেন, তার কোনো ইয়ান্তা নেই। সীমিতসাধ্যের সংকীর্ণতায় আকাশ-কুসুম সাধের বাহারি তালিকায় সাধারণ বিষয় থেকে কত যে অসাধারণ-অসম্ভব বিষয়াশয় এই প্রার্থনাতে উচ্চারিত হয়। অথচ এই বজ্রদেশেরই সন্তান, অনেকের কাছে অখ্যাত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তক অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা দ্বারা অনেককাল আগেই প্রার্থনার ফলাফল শূণ্য বলে প্রমাণিত করেছেন, তা আমরা ক'জনে খবর রাখি! জানা যায়, একবার এই জ্ঞানতাপস ছাত্রদের দ্বারা 'প্রার্থনা করার

প্রয়োজনীয়তা' নিয়ে জিজ্ঞাসিত হলে, উত্তর দেন— "কৃষিজীবী লোক পরিশ্রমের মাধ্যমে শস্য লাভ করে; কিন্তু জগদীশ্বরের কাছে শুধুমাত্র প্রার্থনা দ্বারা কোন কৃষকের কস্মিনকালেও শস্য লাভ হয় নাই।" পরবর্তীকালে তিনি একটি গাণিতিক সমীকরণ তৈরি করে, তাঁর দার্শনিক মন্তব্যের ভিত্তি জোরালো করেন। গাণিতিক সমীকরণটি হচ্ছে এরকম :—

পরিশ্রম = শস্য

পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য

অতএব, প্রার্থনা = ০

অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুঝা যায়, প্রার্থনা দ্বারা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।

(২) টীকা : ধর্মগুরুদের ভণ্ড-প্রতারক বলায় অনেক দুর্বলহৃদয়ের ঈশ্বরবিশ্বাসী মনে চোট পেতে পারেন। দুঃখিত, আপনাদেরকে কারণ ছাড়া ইচ্ছেকৃত চোট দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই; কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এটাই বাস্তবতা। ধর্মের নাম, ঈশ্বরের নাম ইত্যাদি অলৌকিকতার নাম ভাঙিয়ে লোক ঠকানোর রীতি সারা পৃথিবীতেই রয়েছে, আর আমাদের ভারতীয় সভ্যতায় তো এই ইতিহাস অনেকে পুরনো। খ্রিস্টের জন্মের বেশ আগে, আজ থেকে প্রায় ২২০০ বছর আগে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের (৩২২- ২১৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) মন্ত্রী বিষুগুপ্ত বা কৌটিল্য (চাণক্য নামেও পরিচিত), তাঁর অর্থশাস্ত্রে এরকম বেশকিছু নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। এরকম একটি নির্দেশ— "কোন প্রসিদ্ধ পূণ্যস্থানে ভূমি ভেদপূর্বক দেবতা নির্গত হইয়াছেন এই ছলে সেখানে রাত্রিতে বা নির্জনে একটি দেবতার বেদী স্থাপন করিয়া ও এই উপলক্ষে উৎসবাদি ও মেলা বসাইয়া সেই স্থানে শ্রদ্ধালু লোকের প্রদত্ত ধন দেবতাদ্যক্ষ গোপনে রাজসমীপে অপর্ণ করিবেন। ...দেবতাদ্যক্ষ ইহাও প্রচার করিতে পারেন যে, উপবনে একটি বৃক্ষ অকালে পুষ্প ও ফলযুক্ত হইয়াছে এবং ইহা হইতেই সেখানে দেবতার আগমন নিশ্চিত হইয়াছে। ...দেবতাদ্যক্ষ দুর্গের ও রাষ্ট্রের দেবতাগণের ধন যথাযথভাবে একস্থানে একত্রিত রাখিবেন এবং সেইভাবে রাজাকে আনিয়া দিবেন।..." (উৎস: কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, পঞ্চম অধিকরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়, নব্বইতম প্রকরণ।) ছি! ছি! কী বিভৎস! মানুষ ঠকানোর কী জব্বর অপকৌশল! একটা শব্দ হয়তো অনেকের মনে খটকা লাগতে পারে—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দায়িত্ব যার ওপর সর্বোচ্চ অর্পিত থাকে তিনি অধ্যক্ষ হিসেবেই পরিচিত; আবার একইরকম সেনাদের দেখা ও পরিচালনার দায়িত্ব যার ওপর থাকে তাকে বলা হয় সেনাদ্যক্ষ। তাহলে 'দেবতাদ্যক্ষ' আবার কী? এটা কী এরকম যে—মন্দির, পুরোহিত, পণ্ডিতদের দেখাশুনার দায়িত্ব, মন্দিরে ভণ্ডামি করে অর্জিত অর্থ-সোনাদানা ইত্যাদি রাজার কাছে নিয়ে আসার দায়িত্ব সে সময় যার ওপর থাকতো তাকে বলা দেবতাদ্যক্ষ! এরকম হলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এবার গ্রন্থনির্দেশ পেরিয়ে বাস্তবেতিহাসে আসি:— ভারতের সোমনাথ মন্দিরের নাম হয়তো অনেকের জানা আছে। পূর্ব আফগানিস্তানের ছোট্টরাজ্য গজনির সুলতান আমুর মামুদ একাদশ শতাব্দীতে ভারত আক্রমণ করতে এসে পৃথিবীবিখ্যাত এই মন্দিরটি লুণ্ঠন করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় হিন্দুদের অনেক হাঁ-হুতাশ! তবে আমাদের জন্য আসল কাহিনী অন্য জায়গায়। বিশাল এই মন্দিরটি বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে সেই সময়ই বিখ্যাত ছিল; এখানে ছিল প্রায় একহাজার ব্রাহ্মণ, শত শত নতকী ও গায়িকা এবং হাজার হাজার নর-নারীর বাসস্থান। চারিদিকে ছিল অতিসুন্দর কারুকার্য শোভিত নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল বিচিত্র বিবিধ রত্নখচিত বুলন্ত দীপাধার। সব থেকে আশ্চর্যজনক ছিল এই মন্দিরের শিবমূর্তি; বিগ্রহ কোন বেদীতে বসানো ছিল না—অবস্থান করত শূণ্যে, মন্দিরের ঠিক মধ্যখানে। তৎকালীন জনসাধারণের কাছে এ ছিল এক অত্যাশ্চর্যকর বিষয়, অনেকের কাছে অলৌকিক-অপার্থিব ব্যাপার-স্বাপার। তাই চাম্ফুস অপার্থিব ঘটনাকে দেখার জন্য এবং এ জীবনের সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে অক্ষয় স্বর্গ লাভের জন্য প্রতিদিনই ধনী-দরিদ্র-যোদ্ধা-কামার-কুমার-বৈদ্য শত-শত ভক্ত এ মন্দিরে আসতেন এবং নিজেদের প্রচণ্ড পরিশ্রমে

উপার্জিত অর্থ প্রণামী হিসেবে দেবতার পদতলে উজাড় করে ঢেলে দিত। দীর্ঘ বছর ধরে আস্তে আস্তে মন্দিরে জমে উঠেছিল বিশাল ঐশ্বর্য, যা তৎকালীন রাজার কাছে পাঠিয়েও শেষ হচ্ছিল না। সুলতান মামুদও এ মন্দিরের সৌন্দর্যে-রহস্যে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি মন্দিরের সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠনের পর দেবতার শূণ্যে বুলে থাকার কারণ জানতে উৎসুক হলেন। সুলতান তাঁর সঙ্গে আসা বিজ্ঞানী-ধাতুবিদ-বাস্তুকারদের দিয়ে মূর্তিটি পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হলেন, এটি লোহার তৈরি এবং মন্দিরের চারপাশে চুম্বক পাথর বসানো আছে, যার ফলে লোহার মূর্তিটি মাঝামাঝি একটা জায়গায় এনে ছেড়ে দিলে বিভিন্ন প্রান্তের আকর্ষণে এই মূর্তিটি ভেসে থাকছে। এখানে মূর্তি কোন বিষয় নয়, যে কোন লোহা এইরকম মধ্যখানে এনে ছেড়ে দিলে, সেটিও শূণ্যে ভেসে থাকবে। অবশেষে সুলতানের নির্দেশে মন্দিরের দেয়ালে লাগানো পাথরগুলো খুলে ফেলতেই বের হয়ে এল চুম্বকপাথর বা ম্যাগনেটাইট। একপাশের চুম্বক পাথর সরে যেতেই দেবমূর্তিটিও শূণ্য থেকে পড়ে গেল মাটিতে। অলৌকিকতার দাবিদার দেবমূর্তির রহস্য উদঘাটিত হল; কৌটিল্যের সাক্ষাৎ উত্তরপুরুষ মন্দিরের পুরোহিত-দেবতাত্ত্বিকদের কারসাজিতে দীর্ঘকাল ধরেই কী কৌশলে লোক ঠকিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পদ লুটে নেয়া হয়েছিল সেসময়; এটা কী প্রতারণা নয়? হয়তো আমাদের জন্মের অনেককাল আগের কথা বলে অনেকে দাবি করতে পারেন অতীতে কী ঘটেছে সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়, বর্তমানে কী ধর্মের নামে কেউ প্রতারণা করতেছেন? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ অবশ্যই করতেছেন। চোখ-কান খোলা রাখুন, আপনারা নিজেসই ভূরি-ভূরি প্রতারক-বুজরুক ধর্মগুরুদের চিনতে পারবেন। আর যারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান, কষ্ট করে প্রবীর ঘোষের দুই খণ্ডে রচিত *যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা* (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা) গ্রন্থদ্বয় পাঠ করে নিবেন। গ্রন্থদ্বয়ে আপনারা পাবেন বর্তমানকালের বিভিন্ন দেশের অসাধারণ কৌশলী বুজরুক-ভণ্ড ধর্মগুরুদের যুক্তিবাদীদের কাছে বে-আরু হওয়ার কাহিনী ও সাথে টাটকা প্রমাণ। এখানে বাংলাদেশী পাঠকদের অগ্রিম জানিয়ে রাখছি (যারা গ্রন্থদুটি পড়েননি), উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (পৃষ্ঠা ১১৯-১৩২) আছে—প্রবীর ঘোষ এবং তাঁর যুক্তিবাদীদের সাথে বাংলাদেশের বিশেষভাবে (কু)খ্যাত ঢাকার কোটি-কোটিপতি আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু আলহাজ্ব হুজুর দেওয়ান মোহাম্মদ সাইদুর রহমান চিশ্তি সাইদাবাদির (সংক্ষেপে হুজুর সাইদাবাদী) রোমাঞ্চকর লড়াই। হুজুর কলকাতায় গিয়ে দাবি করলেন, তিনি যন্তর-মন্তর করে কাঁচাডিমকে টোকা দিয়ে সেক্কাডিম বানিয়ে ফেলেন এবং সেই ডিমের কুসুম খাইয়ে দিয়ে সন্তান ধারণে অক্ষম নারীকে সন্তানসম্ভবা বানিয়ে দিতে পারেন! কিন্তু প্রবীর ঘোষের পাল্লায় পড়ে কোথায় তাঁর কেরামতি দেখাবেন, তা না—উল্টো মান-সম্মান খুঁইয়ে হুজুর পালিয়ে ঢাকা চলে আসলেন। এই পালিয়ে আসার পরও হুজুরের হুঁশ হলো না, পরবর্তীতে আরো দুবার গোপনে ভারত সফর করলেন। এরপর ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৭)-তে কলকাতাতে আমাদের হুজুর বুজরুকি, প্রতারণা ও ড্রাগ এন্ড ম্যাজিক রেমেডিজ এক্ট ভঙ্গ করার দায়ে গ্রেপ্তার হন কিন্তু বাংলাদেশী রাষ্ট্রনায়কদের দেনদরবারে (হুজুরের খাসবান্দা হিসেবে আমাদের এরশাদ থেকে বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনার নাম পর্যন্ত আছে!) ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশী বুজরুক ধর্মগুরুকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

(৩) রাজেশ দত্ত, *মনোবিজ্ঞানের আলোকে ঈশ্বর দর্শন*, র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

(৪) প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক* (১ম, ২য়, ৪র্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী, *মনের বিকার ও প্রতিকার*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। অরুণকুমার রায়চৌধুরী, *অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

(৫) টীকা : প্রাণীর সব রকমের ত্রিক্রিয়াকলাপই পরাবর্তক্রিয়া বা Reflex। এটি দুধরনের; শারীরিক্রিয়া ও মননক্রিয়া। পরাবর্ত সম্পর্কে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ইভান পেত্রভিচ পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) বলেন :

"বহির্বাস্তবের ঘটনাবিশেষের সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংযোজন ব্যবস্থার ফলে গঠিত জীবদেহের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে পরাবর্ত বলে।" পাভলভ এখানে 'নির্দিষ্ট' শব্দটিতে বেশ জোর দিয়েছেন, কারণ তাঁর মতে—বহির্বাস্তবের বিশেষ উদ্দীপকটি যতবারই প্রয়োগ করা হোক না কেন, ততবারই একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে; অন্য কোন উদ্দীপকে সেই নির্দিষ্ট সাড়া জাগবে না। এই প্রতিক্রিয়া বা সাড়া স্নায়ুতন্ত্রের এক নির্দিষ্ট সংযোজন (কার্য-কারণ) ব্যবস্থার ফল। আর 'শর্তাধীন পরাবর্ত' হচ্ছে—যে সকল ক্রিয়া অস্থায়ী, প্রাণীবিশেষের জীবদ্দশায় বাইরের পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার প্রচেষ্টায় আয়ত্ত অর্থাৎ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ধরনের পরাবর্ত। একটা উদাহরণ দিই; কোনো ধরনের খাদ্যদ্রব্য মুখগহ্বরের সংস্পর্শে আনলে জিহ্বায় লালা নিঃসরিত হয়। শুকনো খাদ্যকে সিক্ত করা কিংবা কঠিন খাদ্যদ্রব্যকে লালায় সিক্ত করে নরম করা হয়, যাতে এই নরমখাদ্যদ্রব্য খাদ্যনালী দিয়ে সহজে পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছতে পারে; এটা (লালা নিঃসরণ) প্রাণীর শারীরবৃত্তিমূলক ধর্ম বা শর্তাধীন পরাবর্ত। আবার কোন খাদ্যের চেহারা-রঙ দেখার অথবা গন্ধ নাকে যাবার দরুন যে লালা নিঃসরণ হয়, তা শর্তাধীন পরাবর্ত। লালা নিঃসরণের মতো প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মূলত রঙ, গন্ধ বা শব্দের কোন সম্পর্ক নেই। এই ধর্ম বা প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রাণী জন্মায় না, জীবদ্দশায় এটি অর্জিত হয়। শর্তাধীন পরাবর্তের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে পুরনো পরাবর্তের প্রয়োজন না থাকলে, আস্তে-আস্তে এটি ভেঙ্গে পড়ে; নতুন পরিবেশের সাথে অভিযোজনের মাধ্যমে নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠে। পরাবর্ত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহীরা পড়তে পারেন—পাভলভ ইনস্টিটিউট, কলকাতা থেকে ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত *পাভলভ পরিচিতি*, পৃষ্ঠা : ৮- ২০।

(৬) টীকা : বিভিন্ন ধর্মের মহাপুরুষদের ধর্মপ্রচারের বেশ মজার-মজার কাহিনী প্রচলিত আছে। এরকম কাহিনীগুলোর মধ্যে সামান্য কটি উল্লেখ করছি—হিন্দুধর্মের মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ শিবলিঙ্গ মনে করে নিজের পুরুষাঙ্গকে পূজা করতেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, উন্মাদ অবস্থায় লিঙ্গে মুক্তা পরিয়ে জীবন্ত লিঙ্গপূজা করতেন (উৎস: শ্রীম কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃত, মূলপাঠ, চতুর্থভাগ, ১৫শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২১)! বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, তৈলঙ্গ স্বামী নিজের প্রস্রাব দিয়ে কালীর অর্চনা করতেন; প্রস্রাব করে কালীমূর্তির সারা শরীরে ছিটিয়ে দিতেন (উৎস: ভারতের সাধক, শঙ্করনাথ রায়, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০)! লোকনাথ ব্রহ্মচারী বলতেন, "আমার বিনাশ নাই, শ্রাদ্ধ নাই, আমি নিত্য পদার্থ। ...শতাধিক বৎসর পাহাড়পর্বত পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি। আমি দেখেছি আমাকে। (উৎস: অলৌকিক লীলাপ্রসঙ্গ, নন্দলাল ভট্টাচার্য, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩)।"—হায়রে ধর্মান্বিতার! আপনাদের লীলা, বোঝা বড় ভার! ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায়, নবি ইব্রাহিম (কারো কারো কাছে আব্রাহাম) একদা স্বপ্নে আল্লাহর কাছ থেকে প্রিয় বস্তু বিসর্জনের নির্দেশ পেলেন। তিনি ধরে নিলেন, প্রিয় বস্তু হচ্ছে নিজের সন্তান। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলছি, কোরবানির জন্য নির্ধারিত সন্তান নিয়ে ইসলামধর্মের সাথে ইহুদি, খ্রিস্টান ধর্মের একটু বিরোধ আছে। তৌরাত শরিফের জেনেসিস অধ্যায়ের ২২:১-১৯ থেকে জানা যায় আল্লাহতায়াল্লা কোরবানির জন্য নবি ইব্রাহিমের কাছে হযরত ইসহাককে মনোনীত করেছেন; আর কোরানশরিফে সরাসরি বলা নেই, কোরবানির জন্য মনোনীত সন্তানটি কে? (সুরা সাফফাত, ৩৭:১০২-১০৭), তবে অন্যান্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ইসলামিচিন্তাবিদরা বলেছেন, আল্লাহর কাছে কোরবানির জন্য মনোনীত সন্তান হচ্ছে হযরত ইসমাইল। আগ্রহীরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পাঠ করতে পারেন, বেনজীন খান সম্পাদিত *পশু কোরবানি: একটি বিকল্প প্রস্তাব*, সংস্কার আন্দোলন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৫২-১৬৪। যা হোক, এ বিষয়টি নিয়ে আপাতত বিতর্ক না করে বলা যায়, নবি ইব্রাহিম আল্লাহর প্রেমে এতোই অন্ধ হয়েছিলেন যে, স্বপ্নের বিষয়কে সত্য মনে করে, নিজের সন্তানকে পর্যন্ত কোরবানি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন! আবার, ইসলামধর্মের শ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ কোরানশরিফ না-কী

একসময় *লওহে মাহফুজে* সংরক্ষিত ছিল (৮৫:২২)। কিন্তু অবাধ বিষয়, নবি হযরত মোহাম্মদের অনেক সামান্য ব্যক্তিগত ঘটনাও অপ্রাসঙ্গিকভাবে পবিত্র (?) কেতাবে ঠাঁই পেয়েছে; যেমন—চাচা আব্দুল উজ্জার সাথে ব্যক্তিগত রেষারেষি থেকে ঝগড়া হওয়ার কারণে একটি সুরাই (আল লাহাব, ১১১) নাজিল (?) হয়েছে, পোষ্যপুত্রের স্ত্রী জয়নবকে বিয়ে করার অনুমতিও আসে স্বয়ং আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে (সুরা আহজাব, ৩৩:৪, ৩৭)। নবি মোহাম্মদের একাধিক স্ত্রীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে আল্লাহ বাণী পাঠিয়ে দেন জিবরাইল মারফত (সুরা তাহরিম, ৬৬:৩-৫), বিবি আয়েশাকে নিয়ে একটি গুজবে সৃষ্ট কেলেঙ্কারী দূর করতে (সুরা নূর, ২৪:৪-৫) এগিয়ে এল জিবরাইল, সঙ্গে আবাবরো আল্লাহর বাণী! এখন, যদি কেউ ধারণা করেন—তৎকালীন সময়ে নবি হযরত মোহাম্মদ অনাকাঙ্ক্ষিত নানা ঘটনা থেকে মুক্তির জন্য, অথবা বিভিন্ন ঘটনার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য কৌশলে নিজের বক্তব্যকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বাণী বলে প্রচারিত করেছেন; তবে ঐ ব্যক্তির ধারণা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে করেন কী?

(৭) টীকা : প্রতিটি ধর্মের মহাপুরুষ সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তাঁরা সবাই নির্জনে বনে-জঙ্গলে কঠোর ইন্দ্রিয়সংযমের মাধ্যমে ধ্যানস্থ হতেন, নিজ-নিজ ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। যেমন—রামকৃষ্ণ ছোটবেলায় গভীর জঙ্গলের কাছে শ্যামানঘাটে গিয়ে প্রায়ই একাকী কালীমায়ের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই অকপটে স্বীকার করেছেন—ভগবৎ-প্রেমের জন্য তাঁর এ বাহ্যজ্ঞানহীনতা নয়, বরং মন্দিরে সাধকদের নানা নিয়ম, কঠোর ব্রতাদি পালন ইত্যাদি করতে করতে মাথায় গুণ্ডগোল দেখা দেয়, মনোবৈকল্যের সৃষ্টি হয়েছে (উৎস: শিবনাথ শাস্ত্রী, *মহানপুরুষদের সান্নিধ্যে*, পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২)। ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবি হযরত মোহাম্মদ তৎকালীন সময়ে লোকালয় থেকে অনেক দূরে হেরা পর্বতের গুহায় সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় আল্লাহর উপাসনা করতেন। বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে জনমানবশূণ্য পরিবেশে এরকম কঠোর ইন্দ্রিয়সংযমের মাধ্যমে দীর্ঘদিন অবস্থান করলে মস্তিষ্কের কার্যকলাপে বিকৃতি ঘটা স্বাভাবিক ব্যাপার।—এ আমার নিজস্ব কোন বক্তব্য নয়, মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ ঘোষণা। এখানে কানাডার প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ড. হেবের একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করতে পারি। ড. হেব কয়েকজন সুস্থ যুবককে একটি ছোট ঘরের মধ্যে মাত্র ছত্রিশ ঘন্টা থেকে দশদিন পর্যন্ত ইন্দ্রিয়বোধ থেকে বঞ্চিত করে রাখার ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষার জন্য ঘরটা অন্ধকার ও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ছিল। ঘরের দেয়ালগুলো ছিলো নিরেট, শব্দরোধী—যাতে বাইরের কোনো আওয়াজ ভেতরে আসতে না পারে এবং ভেতরের আওয়াজ বাইরে না যেতে পারে। হাতে দস্তানা পরিয়ে ও কার্ডবোর্ডের টিউব লাগিয়ে স্পর্শানুভূতিকে অকেজো করা হয়েছিল। ছত্রিশ ঘন্টা পের না হতেই ঐ যুবকদের নানা রকম মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; নিঃশব্দতা, অন্ধকার, নিঃসঙ্গতা, ইন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয়তা মস্তিষ্কের কোষগুলো সহ্য করতে পারল না। মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সকলের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে 'হ্যালুসিনেশন' ও 'ডিলিউশন' দেখা দেয়। আধুনিককালে মহাকাশ শারীরবৃত্তের গবেষণা থেকেও জানা গেছে, ইন্দ্রিয়জ সংবেদরহিত হলে মস্তিষ্কে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; মস্তিষ্কের সুস্থ ও স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য ইন্দ্রিয়গুলোর সজাগ ও সক্রিয় থাকা খুব জরুরী (উৎস: রাজেশ দত্ত, *মনোবিজ্ঞানের আলোকে ঈশ্বর দর্শন*, র্যাডিকেল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪)।

(৮) উপরের তিনটি মানসিকঅসুখ ও নানা কেসস্টাডি নিয়ে বেশ প্রাণবন্ত আলোচনা রয়েছে প্রবীর ঘোষের *অলৌকিক নয় লৌকিক* সিরিজ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে।

(৯) প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক* (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। ভবানী প্রসাদ সাহু, *ভূত ভগবান শয়তান বনাম ড. কোভুর*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

(১০) টীকা : "পরামনোবিদ্যা (Parapsychology)" নামটি অনেকের কাছেই পরিচিত। ইদানীং বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই এ নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে। তবে দুঃখের কথা হচ্ছে, এ লেখালেখির ফলে আসল সত্যটুকু জানার চেয়ে এ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বেশি। কেন বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে? কারণটা জানার আগে দেখে নিই এই বিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়গুলি কী কী। মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, জাতিস্মার, মৃতব্যক্তির আত্মার সাথে যোগাযোগ (Planchette), ঠিকুজী-কোষ্ঠী, রাশিবিচার, ভবিষ্যদ্বাণী, ব্ল্যাকম্যাজিক ইত্যাদি। প্রচারের দৌলতে কূটকৌশলী ধর্মতত্ত্ববিদ-পরামনোবিদরা দাবি করে থাকেন মনোবিজ্ঞান যেরকম একটি বিজ্ঞান তেমনিই পরামনোবিদ্যা একটি বিজ্ঞান; কিন্তু নামের মিল থাকলেই তো দুটি বিষয় এক হয়ে যেতে পারে না। যেমনটা জ্যোতিষশাস্ত্র (astrology) দাবি করে আসছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের (astronomy) মত বিজ্ঞানের একটি শাখা, কিংবা অধুনা যেমন বাইবেলিয় সৃষ্টিতত্ত্বে ভরপুর "ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন" দাবি করছে জীববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত! তারা দাবি করলেই তো হল না, বিজ্ঞান চায় প্রমাণ। জ্যোতির্বিজ্ঞান যেমন তার শরীরে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা আবর্জনা (জ্যোতিষশাস্ত্র) ইতোমধ্যে ঝেড়ে ফেলেছে, মনোবিজ্ঞানও তেমনি দেহাতিরিক্ত আত্মা, মন ইত্যাদি অপার্থিব বিষয়কে ছেঁচে ফেলে দিয়েছে। এটি এখন বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মত সম্পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের ওপর নির্ভরশীল এবং জীবের আচরণসংক্রান্ত অভিজ্ঞনতামূলক বিজ্ঞান। তারপরও পরামনোবিদরা নিজেদের বক্তব্যকে বিজ্ঞানসম্মত বলে যে সকল প্রমাণ হাজির করেছেন, তার কোনোটিই এ পর্যন্ত ধোপে টিকেনি। অনেকের ভিতর এ প্রশ্ন আসবে, এ বিদ্যা যদি অবৈজ্ঞানিক হয়, তবে তারে নিয়ে এত মাতামাতি কেন? উত্তরটা এভাবে দেয়া যায়, এ পৃথিবীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার অনেককিছুই অবৈজ্ঞানিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন (যেমন— চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণের সময় খাবার গ্রহণ করা যাবে না, নষ্ট করে ফেলতে হবে, জিন-ভূত-পেট্রি-দৈত্য-আত্মা-ঈশ্বর-আল্লাহ-ভগবান ইত্যাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস, তুক-তাক-বাণ মারা ইত্যাদি); কিন্তু এগুলো হাজার বছর ধরে টিকে আছে, শুধু টিকে আছে নয় বিপুল বিক্রমেই রাজত্ব করছে। পরামনোবিদ্যার অবস্থাও অনেকটা সেরকম। যাহোক, মূলত ১৯৭৪ সালের দিকেই এই ছদ্মবিজ্ঞানের (Pseudoscience) খুব রমরমা অবস্থা শুরু হয়, কারণ ঐ সালে যুক্তরাষ্ট্রের "American Society for the advancement of Science"-এ পরামনোবিদ্যার সংস্থা বিশেষকে সভ্য হওয়ার অনুমতি দেয়। যেমনটা—(অনেকের হয়তো জানা আছে), ভারতের বিজেপি সরকার ২০০১-এ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউ জি সি) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে "বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র"-কে বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করছে! মজার খবর হচ্ছে—পরামনোবিদ্যার পালে জোর হাওয়া থাকাকালিন সময়েই আমেরিকার নর্থ-ক্যারোলিনার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. জে বি রাইন এবং তাঁর স্ত্রী লুইসা ই রাইন পরামনোবিদ্যা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা (?) করেন ও পুস্তিকা প্রকাশ করেন, এবং একসময় ড. রাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমনোবিদ্যা বিভাগের ডাইরেক্টর হন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ড. রাইনের কথিত গবেষণার ফলাফল যাচাই-বাছাই করতে গিয়ে তাঁর গবেষণা কাজের অবৈজ্ঞানিক দিকটি ধরা পড়ে যায়, তখন ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় বাধ্য হয়ে ড. রাইনের "গবেষণা" কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এতেও দমে যান না ড. রাইন। তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং আরেক ধাপ্পাবাজ ওয়াল্টার লেভি মিলে নর্থ ক্যারোলিনা স্টেটের ডারহাম-এ গঠন করেন Institute of Parapsychology। ওয়াল্টার লেভি হন প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর। ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে ওয়াল্টার লেভি পরামনোবিদ্যার সফল পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের হাতে ধরা পড়ে যান। এই প্রতিষ্ঠানে যারা, তিনজন উদ্যোক্তা (গ্রেট ধাপ্পাবাজ)-র চাপাবাজিতে মুগ্ধ হয়ে পরামনোবিদ্যায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং জড়িত হয়েছিল, তারাই পরবর্তীতে অতীন্দ্রিয় পরীক্ষার সফলতার পেছনে লৌকিক যান্ত্রিক কৌশল ও উদ্যোক্তাদের হাতসাহায্যই এর কারবার রয়েছে, প্রকাশ করে দেয়। এভাবে জনসমক্ষে নিজেদের ভণ্ডামো উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় ডাইরেক্টর ওয়াল্টার লেভি চূড়ান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় মিস্টার ও মিসেস রাইনকে ফেলে রেখে পালিয়ে যান। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এঁদের এহেন কর্মকাণ্ড সর্বসাধারণের সামনে

বেআক্র হওয়ার পরও সারা বিশ্বে পরামনোবিদ্যার চর্চা বন্ধ হয়নি। বরং সময়ে সময়ে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরো জানতে পড়ুন : প্রবীর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৭। এবং ভবানী প্রসাদ সাহু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৮-১২০।

(১১) ভবানী প্রসাদ সাহু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯-৫১।

(১২) টীকা : গুজব বাঙালিসমাজের মধ্যে বেশ পরিচিত এবং ভয়ঙ্কর একটি শব্দ (হুজুগ শব্দটিও প্রায় কাছাকাছি অর্থবোধক); 'হুজুগে-বাঙালি' বলে আমাদের একটি বদনামও রয়েছে সারা বিশ্বে। এটা অনেকটা সংক্রামক ব্যাধির মতো, একবার আক্রান্ত হলে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব—যদি না গুজবগ্রস্তরা যুক্তিবোধ-বাস্তবনীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। চীনদেশি প্রবাদে আছে— "একটি গুজব একটি মাত্র কানে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু শতমুখে প্রচারিত হয়।" সাধারণভাবে গুজব বলতে আমরা বুঝে থাকি, "এক ধরনের অলীক বিবৃতি বা বক্তব্য, যা কখনো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে, কখনো মানুষের প্রচারপ্রিয়তা অথবা রুদ্ধ আবেগের প্রকাশ সূত্র-ধরে, কার্যত এক ধরনের 'হয়ত-সত্য', 'প্রায়-সত্য' ইত্যাদি রসালো রঙে রাঙা য়িত হয়ে শতমুখে বিচিত্র ও রোচক চেহারায় পরিণত হয়। এরই ফলে মূল ঘটনাটি প্রায়শই বিকৃত হয়ে পড়ে, এবং সৃষ্টি হয় এক ধরনের সামাজিক বিভ্রান্তি।" অস্বীকার করা যাবে না, গুজবের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে খুব ছোট ছোট চেহারার সত্য লুকিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু শতকণ্ঠে প্রচারের ফলে বিষয়টি এত বেশি ফুলেফেঁপে ওঠে যে, তার মধ্যে সত্যটিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন— খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতো। গুজব সৃষ্টির বিভিন্ন কারণ রয়েছে, সমাজতাত্ত্বিকদের মতে— যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, দুর্ভিক্ষ বা মড়ক, আত্মপরিচিতির সংকট (Self-identity crisis) ইত্যাদি সামাজিক বিপর্যয়ের সময় বিবিধ গুজব সৃষ্টি হয়। এখানে ব্যক্তিগত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি; বেশ কিছুদিন আগে কোনো এক বন্ধের দিনে আমরা কয়েক বন্ধু আড্ডা দিচ্ছিলাম। আড্ডার বিষয় অনেক কিছু, রাজনীতি-অর্থনীতি, দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি। আস্তে আস্তে টের পেলাম আড্ডার বিষয় পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, — মোড় নিল আধুনিককালে ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা, ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান ইত্যাদি। সবাই অনেক কিছু বলতে লাগলো। কেউ পক্ষে-কেউ বিপক্ষে। এরমধ্যে হঠাৎ করে একজন ক্ষেপে ওঠলো, গলার রং ফুলিয়ে, মুখ লাল করে অতিদ্রুত কি-সব বলতে লাগলো। প্রথমে বুঝতে পারি নাই, দ্বিতীয়বার বলার পর বুঝলাম, মোটামুটি এরকম— "তোরা তো কিছুর জানিস না, বেহুদা চিল্লাফাল্লা করে তোদেরও গুনাহ হইতেছে আর আমরাও এর ভাগীদার হইতেছি। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা "নাসা"-র গবেষণাগারে পর্যন্ত আমাদের পবিত্র কিতাবটি (ইচ্ছা করেই পবিত্রকিতাবের নামোল্লেখ করলাম না) রাখা আছে। নাসার বিজ্ঞানীরা আমাদের এই ধর্মগ্রন্থ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দিনরাত গবেষণা করতেছে। গুঁদের এই মহাকাশ গবেষণা বলিস আর প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা বলিস, এগিয়ে যাওয়ার মূল কারণ— আমাদের এই ধর্মগ্রন্থ। আমাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে সব তথ্য নিয়ে ওরা এগুলো করতেছে!" — বন্ধুর আহাম্মকি কথা শুনে প্রথমে হাসবো না কাঁদবো ঠিক বুঝে পেলাম না। ঠিক একই ধরনের বক্তব্য অনেকদিন ধরেই একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্নজনের (স্বল্পশিক্ষিত থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষিত, মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া থেকে শুরু করে মাদ্রাসা পড়ুয়া) কাছ থেকে শুনিছি। কেউ কেউ আবার এর সাথে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের একটি অর্ধটুকরো বক্তব্য বডব বড়াই করে তুলে ধরে ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞানের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে চান! বন্ধুকে আমি এ সুযোগে ক্ষেপানোর জন্য বললাম, জব্বর খবর! এতো কিছু জেনেও তুমি বন্ধু মুখে আঙুল দিয়ে বসে আছো? মিস্টেক, ভেরি মিস্টেক! তা তোমাদের আমেল-কামেলরা কোথায়? এতোদিন ধরে কী করছেন? ইহুদি-নসারা সব অমূল্য জ্ঞান তোমাদের পবিত্র কিতাব থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে, আর তোমরা চেয়ে-চেয়ে দেখছো। শেইম! শেইম! অন্তত আমেল-কামেলদের তো উচিত পবিত্র ঐ কিতাব থেকে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান আগেভাগেই আমাদের বিজ্ঞানী-

গবেষকদের জানিয়ে দেয়া। তাহলে আমাদের মত গরিব দেশের আর ইহুদি-খ্রিস্টান পশ্চিমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না? আমার কথার জবাবে বন্ধুটি কিছু বলতে গিয়েও বললো না; মনে হলো রক্তবর্ণ চোখ দুটি দিয়ে ভস্ম করে দিতে চাইছে। অথবা আমার মত পাগলের সাথে কথা বলে বৃথা সময় নষ্ট, ভেবেই চূপ করে গেল। যা হোক, বিষয়টি নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ভেবেছি, এক শ্রেণির মানুষের কাছে কেন "ধর্মগ্রন্থ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর"-হিসেবে ভূষিত হচ্ছে? আজ "বিজ্ঞানের অপ্রতিরোধ্য যাত্রায় ধর্মবাদের মধ্যে আত্মপরিচিতির (সঠিক করে বললে "ধর্মীয় পরিচিতি" হবে) সংকট সৃষ্টি করেছে" — বলেই কী এই ধরনের ডাহা গুজব অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে? আমার কাছে মনে হয়েছে, — "যেমন করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ-আমেরিকার ক্রমবর্ধমান বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ গ্রহণের (পাশাপাশি ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব) প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৯-২০ সালে গঠিত World's Christian Fundamentals Association কিংবা National Federation of Fundamentalists ইত্যাদি নামের সংগঠনের মাধ্যমে খ্রিস্টান মৌলবাদী আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়, তৎকালীন ভারতেও ডি ডি সাভারকার, বাবুরাও সাভাকার, হেডগেওয়ার, গোলওয়ালকার প্রমুখের তীব্র হিন্দু মৌলবাদী হিসেবে আবির্ভাব ঘটে, স্বাধীনতার পর নকশালবাদী আন্দোলনের পরমুহূর্তেই সমগ্র ভারতবর্ষে মাতা সন্তোষী-সাঁইবাবা-সাঁইকৃষ্ণের মতো সাজানো দেবতার-ভণ্ডের বাজার সৃষ্টি করা হয়েছিল, ইজরাইল রাষ্ট্র গঠনের প্রতিক্রিয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামি মৌলবাদের দ্রুত উন্মেষ ঘটে, আফগানিস্তানে সোভিয়েতবাহিনীর সাথে লড়াই করার জন্য আমেরিকা-পাকিস্তান-সৌদি আরবের প্রচেষ্টায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মুজাহিদ্দীন সংগ্রহ করে ইসলামি মৌলবাদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে শক্ত ভিত্তির মধ্যে দাঁড় করানো হয়েছিল, তেমনি হয়তো আজ নাইন-ইলেভেনের পরবর্তী ডামাডোলের ফলে আবারো কয়েকটি ধর্মীয় মৌলবাদ ভয়াবহ রকমে বিকাশের পথ পেয়ে গেছে, যার বিচ্ছুরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের আজগুবি সব গুজবে। সাথে সাথে আধুনিকবিজ্ঞানের নিত্যনূতন আবিষ্কার হয়তো "নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা নিয়ে" ধর্মবাদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে।" আমি নিশ্চিত নই, তবে অস্বীকারও করতে পারছি না। মূল আলোচনায় ফিরে যাই, আধুনিককালে কেউ কেউ 'গুজব'-কে চক্রান্ত তত্ত্ব (Conspiracy theory)-এর আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের মতে — "চক্রান্ত তত্ত্বের মূল ভিত্তি হলো গুজব। চক্রান্তের সঙ্গে গুজবের একটি সংযোগ স্থাপিত না হলে চক্রান্ত এবং গুজব কোনোটিই সজীব বা সচল হওয়ার প্রাণ বা মাটি পায় না"। আমাদের বাংলাদেশ, পার্শ্ববর্তী ভারত, এবং তৃতীয়বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে রাজনীতি এবং ধর্ম নিয়ে সবচেয়ে বেশি চক্রান্ত করা হয় তাই এগুলিকে নিয়ে বেশি গুজবও তৈরি হয়; এবং এই গুজব প্রচারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে সংবাদপত্রগুলো। ইউরোপ-আমেরিকায় সাধারণ জনগণের মধ্যে ধর্মের রেশ (পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুলনায়) একটু কমে যাওয়ার ফলে সেখানে কৌশলে বিজ্ঞানের নামে উদ্ভূত ধর্মীয়গুজব ছড়ানো হয় অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে; যেমন — জার্মানির নাগরিক এরিক ফন দানিকেনের বিশ্রান্তকর "দেবতারা ভিনগ্রহের মানুষ" প্রকল্প, আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত বারমুডা দ্বীপপুঞ্জ, পোর্টরিকো ও ফ্লোরিডাকে নিয়ে ত্রিভূজ কল্পনা করে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল নাম দিয়ে চার্লস বার্লিজ কর্তৃক ১৯৭৪ সালে "দি বারমুডা ট্র্যাঙ্গল" নামের গ্রন্থে আধ-খাওয়া সত্যের মিশেল দ্বারা চাপাবাজিপূর্ণ প্রপাগান্ডা, উইলিয়াম আলবার্ট ডেম্বস্কি, মাইকেল বিহে, ফিলিপ জনসন, জোনাথন ওয়েলস প্রমুখের বিবর্তনবাদ বিরোধী বাইবেলিয় সৃষ্টিতত্ত্বের আলোকে "ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন" থিওরি ইত্যাদি। আলোচনার পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে আমরা এখানে ধর্মকেন্দ্রিক গুজবের কয়েকটি উদাহরণ টানবো : — (১) ১৯৬৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'অ্যাপেলো : ৮' উপগ্রহের চন্দ্রাভিযান এবং তার ফলস্বরূপ ১৯৬৯ সালে 'অ্যাপেলো : ১১'-র অভিযান সফল হয়। নীল আর্মস্ট্রং এবং এডুইন অলড্রিনের চন্দ্রে অবতরণ মহাকাশ-গবেষণা নিয়ে মানবসভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হিসেবে চিহ্নিত হয়। কিন্তু কতিপয় স্বার্থবাদী-ধর্মবাদী বুজরুক সংস্থা তাদের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকলাপ চালু রাখার জন্য

মানুষের চন্দ্রাবতরণ একটি মিথ্যা ঘটনা—এই মর্মে প্রচার চালাতে থাকে। পশ্চিমবিশ্বে খ্রিস্টান মৌলবাদীদের অর্থায়নে পরিচালিত 'আন্তর্জাতিক সমতল পৃথিবী সংগঠন'—এই প্রচার চালাতে থাকে। এই সংগঠনের সচিব স্যামুয়েল শেনটন এবং চার্লস জনসন প্রচার করতে থাকেন চন্দ্রাবতরণের ঘটনা ঘটেছিল হলিউডের স্টুডিওতে; এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ঘটনা—যা চলচ্চিত্রের মতোই সাজানো। কয়েকদিন পর আরেকটি ভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন প্রচারণা শুরু করলো—নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি সেখানে আজানের ধ্বনি শুনেছেন (চাঁদে যে বাতাস নেই, এরা মনে হয় জানে না!), তাঁদের ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা মতো চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত দেখে এসেছেন—যার কারণে নীল আর্মস্ট্রং পৃথিবীতে ফিরে এসে ধর্মান্তরিত হয়েছেন! এ দুটি সংগঠনের বিজ্ঞানবিরোধী অপপ্রয়াস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষের চাঁদে গমনের ফলে তাঁদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত (দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা লোকঠকানো) সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ঈশ্বর-পয়গম্বরের অলৌকিক ক্ষমতা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে, ফলে ভবিষ্যতে ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের মূল্য দেখিয়ে ব্যবসা করা দুঃসাধ্য হয়ে যাবে। তাই ওরা চক্রান্ত করে নিজস্ব মতটি প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন মহাকাশ-গবেষণা সংস্থা,—তথা সমগ্র বিজ্ঞান গবেষণাকেই হেয় করতে চাইছে। (২) গত বছর (২০০৬) একুশে আগস্ট ভারতের মুম্বাই শহরের কাছাকাছি মাহিম সমুদ্রতীরের কাছে দরগার এক পিরবাবা প্রচার করলেন—আরব সাগরের জল আল্লাহর দয়ায় মিষ্টি ও পবিত্র হয়ে গেছে। এই গুজব ছড়িয়ে দেয়া মাত্র সারা শহরে খোদা-ভক্তির জোয়ার শুরু হয়ে গেল, মানুষ কথিত পবিত্র জল সংগ্রহের জন্য ভিড় করতে শুরু করলেন এবং জলপানও করতে লাগলেন। মুম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক দূষণ সংক্রান্ত নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন ধর্মের ও বয়সের মানুষ ঐ সমুদ্রজল পান করতে লাগলেন। মূলত ঘটনা হলো দূষণের কারণে ঐ অঞ্চলের সমুদ্রজলে লবনের পরিমাণ অত্যধিক কমে গিয়েছিল। এছাড়া মাহিম সমুদ্রতটটি মিঠি নদীর মোহনায়। এ সময়ে কোনো কারণে মিঠি নদীতে জলস্ফীতি হওয়ায় মিঠি নদীর মিষ্টিজল মাহিম অঞ্চলের সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, ফলে ঐ অঞ্চলের জলে লবনের পরিমাণ আরো উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়। কিন্তু গুজবের ফলে ঐ জল পবিত্র আখ্যা পেয়ে পানীয়ের উপযোগী হয়ে গেল! (৩) হিন্দুধর্মের পীঠস্থান হিসেবে স্বীকৃত ভারতবর্ষে বারোমাসই অবতার-মহাপুরুষদের রমরমা অবস্থা। দুয়েকদিন পরপরই ভারতের এখানে-সেখানে বাবাজী-মাতাজির আবির্ভাব ঘটে এবং মাশাল্লাহ ওনাদের নামগুলোও জব্বর : যেমন—আত্মাবাবা, পাইলটবাবা, লালবাবা, বালতিবাবা, ফ্লাইংবাবা, ডাববাবা, আদ্যামা, বড়িমা, ছোটমা ইত্যাদি। এই নানা কিসিমের বাবাজী-মাতাজির মধ্যে এক সময় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন অন্ধপ্রদেশের সাঁইবাবা; সিন্ধের গেরুয়া আলখাল্লায় ঢাকা, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা এই লোক ভক্তদের কাছে সত্য সাঁইবাবা আর যুক্তিবাদীদের কাছে বুজরুক-শিরোমণি। প্রচারের জেটবিমানে চড়ে তিনি এবং তাঁর ভক্তবৃন্দ সারা ভারতেই একসময় প্রচণ্ড ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করতে পেরেছিলেন, আর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গুজব আর গুজব। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—দেবসম সাঁইবাবা শূণ্য থেকে অলৌকিক উপায়ে ঘড়ি-ছাই বা বিভূতি তৈরি করতে পারেন, সাঁইবাবার ছবি থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি বের হয়, সুগন্ধিযুক্ত বিভূতিও পাওয়া যায় ইত্যাদি। মজার বিষয় হচ্ছে, খুবই সাধারণ কৌশল প্রয়োগ করে এগুলি অহরহ করে চলছেন আমাদের আশেপাশের ম্যাজিসিয়ানরা, কিন্তু তারা কখনোই এগুলিকে অলৌকিক বলে দাবি করেননি। বরং পাবলিককে আনন্দ দেবার সস্তা খোরাক হিসেবে কৌশলগুলো ব্যবহার করেন। এই যে শূণ্য থেকে ঘড়ি সৃষ্টি করা, এখানে মোটেও অলৌকিক কিছু নেই—অনেক আগে থেকেই হাত সাফাইয়ের মাধ্যমে রাস্তার রাম-শাম-যদু-মধু জাদুকর থেকে শুরু করে বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর ডেভিড কপারফিল্ড পর্যন্ত অনেকেই অহরহ এ কাজটি করে আসছেন। শুধু ঘড়ি কেন, মিষ্টি-বল-পাখি-বাক্স-রুমাল ইত্যাদি জিনিষই তারা দর্শকদের সামনে কৌশলে নিয়ে আসেন। এ প্রক্রিয়াটিকে ম্যাজিকের ভাষায় বলে 'পামিং'। পামিং হল কিছু কৌশল, যার মাধ্যমে ছোটখাট কোনো জিনিষকে হাতের মধ্যে অথবা পোষাকের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখা হয়। তারপর একথা-সেকথা বলতে বলতে দর্শকের মনযোগ অন্যদিকে সরিয়ে চটজলদি জিনিষটাকে বের করে

নিয়ে আসা হয়। আর প্রচুর ছাই বের করতে চাইলে হাতের মধ্যে তো আর লুকিয়ে রাখা যাবে না, তখন ছাই ভর্তি ব্লাডার যুক্ত একটি সরু নল বগলের নীচ থেকে হাতের কজি পর্যন্ত বাধা থাকে। পোষাকের নীচে ঢাকা পড়ে যায় এই ব্লাডার ও নল। এরপর সময়-সুযোগ মতো ছাই সৃষ্টি করতে চাইলে শুধু ব্লাডারে একটু চাপ দিলেই হবে। ব্লাডার থেকে ছাই নল বেয়ে একদম হাতে চলে আসবে। কলকাতার বিখ্যাত জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র) একবার এরকম পামিং করে দেখিয়েছিলেন স্বয়ং সাঁইবাবাকে। ১৬-০৪-৭৮ তারিখের ইংরেজি সাপ্তাহিক *সানডে* থেকে জানা যায়, তিনি একবার পরিচয় বদল করে সাঁইবাবার সাথে একবার দেখা করতে যান এবং সাঁইবাবাও তখন চিনতে না পেরে, অন্যান্য নির্বোধ ভক্তের মতো একজন ভেবে ভেলকিবাজি দেখাতে লাগলেন। এক ফাঁকে পি. সি. সরকার সাঁইবাবার মতই শূণ্যে হাত নেড়ে একটি রসগোল্লা নিয়ে আসেন এবং সাঁইবাবার হাতে দেন। হঠাৎ এভাবে অপরিচিতের সামনে নিজের ভগ্নমো উলঙ্গ হয়ে যাওয়ায় সাঁইবাবা আতঙ্কে চিৎকার করে স্থান ত্যাগ করেন। সাঁইবাবার ছবি থেকে যে জ্যোতি নির্গত হচ্ছে বলে গুজব বেরিয়েছে, তা আর কিচ্ছু না—ওটি ছিল *infra-red photography*। এই পদ্ধতিতে ছবি তুললে যে কোনো জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদের শরীর থেকে জ্যোতি নির্গত হচ্ছে বলে মনে হয়। এখানে আলাদাভাবে সাঁইবাবা বা গাধার কোনো তফাৎ নেই। ছবি থেকে সুগন্ধিযুক্ত বিভূতি পড়তে পারে দুভাবে :— (এক) আগে থেকেই কোনো ভক্ত অন্য ভক্তদের চোখে নিজেকে বড় করে তোলার জন্য সুগন্ধি মিশিয়ে বিভূতি সাঁইবাবার ছবির নীচে ছড়িয়ে দিতো অথবা (দুই) সাঁইবাবার ছবির কাঁচে ল্যাকটিক এসিড ক্রিস্টাল মাখিয়ে ঘষে দেয়া হতো। ল্যাকটিক এসিড ক্রিস্টাল বাতাসের সংস্পর্শে এলে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে বিভূতি বা ছাইয়ের মতো ঝরে পড়ে; কার ছবি সেটা বিষয় না। বোঝাই যাচ্ছে "সাঁইবাবা" প্রজেক্টে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ভেলকি দেখিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপরতলার লোকেরা সাঁইবাবার শিষ্য সংখ্যা বাড়াতে চেয়েছিল আর জনসাধারণের মধ্যে একটি উদ্ভট ধর্মীয় উন্মাদনা জিইয়ে রাখার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। (৪) ১৯৯৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় খবরটা বের হয়— "২১ সেপ্টেম্বর দিল্লির এক মন্দিরে দেবতা গণেশ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা নাকি ভক্তের হাত থেকে চামচে করে দুধ পান করেছেন"। খবরটা ছড়াতে যতটা না সময় লাগে, তার থেকে হাজার গুণ বেশি দ্রুত হজুগে মেতে ওঠে ভারতের হিন্দু জনগণ। কাতারে কাতারে মানুষ দেবতাকে দুধ খাওয়াতে মেতে ওঠে যুক্তিতর্কের তোয়াক্কা না করে, —এক হিসেবে দেখা যায় শুধু দিল্লিতেই ঐ সময় ২৫ হাজার লিটার দুধ উবে গেছে দেবতার নামে! এরপর এই গুজবের রেশ দিল্লি ছাড়িয়ে মুম্বাই, কলকাতা পাড়ি দিয়ে নেপাল, সিকিম, বাংলাদেশে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যা বাড়িতে যে ঠাকুর আছেন, তাঁরা সঙ্কলেই চোঁ চোঁ করে দুধ পান করতে লাগলেন। ফলে দেখা গেল—দুদিনের মাথায় দুধের দাম হু হু করে বেড়ে সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। আর মন্দিরের বাইরের নর্দমা দিয়ে ভেসে যেতে লাগলো লিটার লিটার দুধ। হজুগের স্রোতে ভেসে না গিয়ে রুখে দাঁড়ালেন এ অঞ্চলের যুক্তিবাদিরা। তাঁরা মানুষকে বোঝাতে লাগলেন : "তরলের একটা ধর্মই হচ্ছে ছড়িয়ে পড়া। পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে সারফেস টেনশন। উদাহরণ হিসেবে হাতেনাতে দেখালেন, —কেরোসিনের তেলটা সলতের নীচে থাকে। অথচ আলোটা তো তেল পুড়েই তৈরি হচ্ছে, সলতেটা তো এজন্য দাউদাউ করে জ্বলে শেষ হয়ে যাচ্ছে না। কারণ—কেরোসিনের তেল একটু একটু উপরে উঠে আসছে সলতে বেয়ে, আর এজন্যই দীর্ঘসময় ধরে আগুন জ্বলতে পারে। কিন্তু এখন যদি সলতেটা না জ্বালিয়ে, অনেকটা বাড়িয়ে নীচের দিকে নামিয়ে সলতেটা নীচু অন্য একটি কেরোসিনের পাত্রে রেখে দিলে কী হবে? তখন কেরোসিন তেলটা সলতে বেয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমে নীচের অন্য কেরোসিন পাত্রে গিয়ে জমা হবে। ঠিক ঐ ব্যাপারটি ঘটেছে গণেশকে দুধ খাওয়ানোর সময়। গণেশের গুঁড়ের গোড়ায় দুধ ভর্তি চামচ অল্প হেলিয়ে ধরায় দুধের ক্ষীণ ধারা সামান্য একটু উঠে ভুঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে।" কিন্তু এই ভুঁড়ি বেয়ে দুধ নেমে যাওয়া চট করে নজরে আসে না, কারণ—মন্দিরের দেবতার গলায় ফুলের মালা, নানা রঙের পোষাক পড়ানো থাকে। যারা বাসা-বাড়িতে দেবতার মূর্তিকে দুধ পান করিয়েছেন, তারা যদি

একটু কষ্ট করে মূর্তির পোষাকে অথবা শরীরে হাত দিতেন তবে টের পেতেন নেমে যাওয়া দুধের অস্তিত্ব। কিন্তু আফসোস! হুজুগ মানুষকে এতাই কাণ্ডজ্ঞান শূন্য করে ফেলে তা অচিন্তনীয়। পাঠকের হয়তো মনে আছে গতবছরও একই হুজুগে মেতে ছিল ভারত-বাংলাদেশ-নেপাল-কানাডা-আমেরিকার হিন্দুরা। দশ বছর আগেকার ঘটনার সময় দেয়া বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার ধার এবারো ধারে নাই হুজুগে মানুষগুলো। তারা চায় নিত্যনতুন গুজব। যাহোক, এখন উপর্যুক্ত উদাহরণগুলোকে নেড়ে-চেড়ে দেখলে বুঝা যায়:— (এক) প্রত্যেকটি গুজব সৃষ্টির পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ আছে, অথবা বলা যেতে পারে কোনো এক বা একাধিক উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখেই গুজবগুলি ছড়ানো হয়। যেমন : প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে গুজব ছড়ানোর পিছনে দুর্যোগকারীদের প্রধান উদ্দেশ্য অবাধ লুণ্ঠরাজ করা। অপরদিকে ঈশ্বর বা ধর্ম নিয়ে গুজব সৃষ্টির পিছনে রয়েছে ধর্মগুরুর ক্ষমতা-প্রণামী বৃদ্ধি, ভোটের সময় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে একটা ফ্যান্টম হয়ে দেখা দেওয়া, শ্রেণিবৈষম্য টিকিয়ে রেখে এ যুগের "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়"-দের শাসন-শোষণ দীর্ঘস্থায়ী করা। (দুই) প্রকৃতির খেয়ালে যে অস্বাভাবিকত্ব দেখা যায়, তাকে অবলম্বন করে কিছু লোকের মধ্যে ব্যবসা ফেঁদে ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির লিপ্সা কাজ করে। তাই প্রত্যেকটি গুজব তৈরির পিছনে অসৎ বুদ্ধিবাজদের চিন্তার উদ্ভাবনী শক্তিকে স্বীকার করতেই হয়; দেখা যায় এমনভাবে গুজব ছড়ানো হয় যা সচরাচর মানুষের সাধারণ ভাবনায় আসে না। (তিন) আপাত অস্বাভাবিক গুজবের পেছনে নিশ্চিত কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আপাত অপার্শ্বিক-অলৌকিক ঘটনার পেছনে যুক্তিগ্রাহ্য-বিজ্ঞানসম্মত কারণ থাকে, যা পরে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি, হুজুগ দানা বাঁধতে সক্ষম হয় মানুষের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের উপর ভর করে। যেদিন থেকে বিজ্ঞানমনস্কতা আর যুক্তিবাদের আলোয় মানুষের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস কেটে যাবে সেদিন থেকে কোনো গণেশঠাকুর দুধ পান করবেন না, কেউ আর অলৌকিকতায় ভর করে উর্ধ্বলোকে গমন করতে পারবে না, আঙুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবে না, ঈশ্বর-ভূত-প্রেত কোনো ব্যক্তির ওপর ভর করবে না, কোনো অবতারও এ দুনিয়ায় জন্ম নিবে না কিংবা কোনো ধর্মগুরু আর অলৌকিকতাকে নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না। তখন পার্শ্বিক এ জগতে কোনো অপার্শ্বিকতার স্থান থাকবে না, পৃথিবী হবে শুধুই প্রকৃতির আর মানুষের।— বাংলাভাষায় গুজব বা হুজুগ সম্পর্কে একেবারে নৃতাত্ত্বিক আলোচনা জানতে হলে, আগ্রহীরা পড়তে পারেন: পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, "গুজব-হুজুগ ও লোকসংস্কৃতি"-বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৪ ৪ সংখ্যা, ১৪১৩।

(১৩) প্রবীর ঘোষ এবং পিনাকী ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক* (তৃতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৯৪-৩০২।

(১৪) প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক* (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৭৪।

(১৫) টীকা : আমরা দেখেছি এ পৃথিবীতে সব সময়ই কিছু "ঘাড় বাঁকা" লোকের আবির্ভাব ঘটে যারা যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলে; এর জন্য জেলজুলুম-নির্যাতন-ভয়ভীতি কোনো কিছুই পরোয়া করে না। এ জ্ঞানচিন্তক-সত্যানুসন্ধানী-মুক্তচিন্তকের উদাহরণ আমাদের চারপাশে কম নয়; সক্রোটস, গৌতম বুদ্ধ, হাইপেশিয়া, ইবনে সিনা, ওমর খৈয়াম, ব্রুনো, গ্যালিলিও, ডারউইন, মার্ক্স, লেনিন, আরজ আলী, আহমদ শরীফ প্রমুখ। এঁদের কেউবা শোষিত মানুষের পক্ষে, সাম্যের সমাজ গঠনের জন্য নিজেকে আত্মনিবেদন করেছেন, কেউবা মানুষের প্রশ্ন করা-জিজ্ঞাসা-মুক্তচিন্তার অধিকার রক্ষায় নিজেকে আত্মোৎসর্গ করেছেন, কেউবা নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েও কাল্পনিক পৌরাণিক বাণীর কাছে বিজ্ঞানকে মাথা নত করতে দেননি। তাঁরা আমাদের নমস্যা। কিন্তু এ সমাজ-

সভ্যতায় এখনো ভণ্ড-বুজরুক-মানসিক ভারসাম্যহীনদের জাহিলিয়া শেষ হয়নি, চলছে স্টিম রোলার কখনো প্রকাশ্যে, কখনো কৌশলে। তাই শাসকশ্রেণী আর তার পেটোয়া বাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট অপার্শ্বিকতা-অলৌকিকতার আফিমে আসক্ত জনগণের মোহমুক্তির জন্য এখনো কিছু সত্যসন্ধানী-যুক্তিবাদী স্রোতের বিপরীতে অবস্থান করছেন। এঁদেরই একজন আমাদের দেশের অতিপরিচিত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ। বিজ্ঞানমনস্ক এই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই অলৌকিকতার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার প্রয়াসে নিবেদিত। তিনি প্রকাশ্যে (১৯৮৪-৮৫ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত দুটি সাক্ষাৎকার) চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, তিনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের যে কোনো ব্যক্তি যদি ভূত অথবা অন্য কোনো অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে, তবে তাকে দেয়া হবে এক লক্ষ বাংলাদেশি টাকা পুরস্কার। সস্তা জনপ্রিয়তার মোহে নয়, কিংবা জনগণের আবেগকে সুড়সুড়ি দেবার উদ্দেশ্যেও নয়, বরং এ চ্যালেঞ্জ প্রদানের একটাই উদ্দেশ্য, ভদ্রতা-অতিলৌকিকতার মুখোশ পড়ে যারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে, তাদেরকে বেআব্রু করে সহজ সত্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। শুধু আমাদের জুয়েল আইচ নন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা দূর করে যুক্তিবাদী-বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার কাজে নিয়োজিত। এ জন্য প্রয়োজন হলে চ্যালেঞ্জ জানানোর পাশাপাশি প্রকাশ্যে তথাকথিত অলৌকিক দাবিদারদের কাজকারবার, লৌকিক কৌশল প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিচ্ছেন যাতে জনগণের ভুল ভাঙে, অন্ধবিশ্বাসকে নিজের মনন থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে পারে। আমার জানা মতে, সবচেয়ে প্রাচীন (১৮৮০ সালে ইংল্যান্ডে স্থাপিত) প্রতিষ্ঠান Society for Psychical Research এ পর্যন্ত বহু অলৌকিক ক্ষমতার নামে প্রতারণাকে উদ্ঘাটিত করেছে। প্রতারকদেরকে করেছে নগ্ন। বর্তমান বিশ্বে পরিচিত গণিতবিদ ও ম্যাজিসিয়ান জেমস র্যাভি এবং তাঁর Committee for investigation of claims of the paranormal (CSICOP) নামক প্রতিষ্ঠানটি এক মিলিয়ন ডলার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি অলৌকিকতাকে লৌকিক কৌশল ব্যতিরেকে দেখাতে পারে তবেই তাকে এ পুরস্কার দেয়া হবে। সারা বিশ্বে প্রায় পঞ্চাশটির অধিক শাখা-সংগঠন খুলে তথাকথিত অতিলৌকিক কর্মকাণ্ড, অবতারদের রহস্য অনুসন্ধান, প্রকাশ, অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ে চলছে অবিরাম। এখানে আরেকজন যুক্তিবাদী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতেই হয়, যিনি আজীবন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে লড়াই করে গেছেন। শ্রীলংকার ড. আব্রাহাম টি. কোভুর (১৮৯৮-১৯৭৮)। ড. কোভুর মানুষের চেতনা মুক্তির জন্য, অন্ধবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যকে গ্রহণ করতে পারবে—এই বোধ থেকে দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়ের দ্বারা দুটি বই "Begone Godmen" এবং "Gods, Demon & Spirits" রচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে রচিত এই দুই বইয়ে বহু আপাত অলৌকিক ঘটনা, অপ্রাকৃতিক-অতীন্দ্রিয়বাদের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, সাথে সাথে জনগণের স্বার্থবিরোধী ও শাসকশ্রেণির স্বার্থপুষ্টিকারী বাবাজী-মাতাজীদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। ১৯৬৩ সালে সমস্ত পৃথিবীর সামনে ড. কোভুর অলৌকিকতা-অপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে এক লক্ষ শ্রীলংকান রুপির চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন। ড. কোভুর বলতেন, অবতার, সাধু, যোগী, সিদ্ধ পুরুষ, গুরু স্বামীজি ও অন্যান্য যারা দাবি করেন, আধ্যাত্মিক তপস্যা বা ঈশ্বরের আশীর্বাদে তারা অলৌকিক ক্ষমতা রপ্ত করেছেন তারা যদি যে কোনো একটি অলৌকিক কাজ কোনো কৌশল ব্যতিরেকে দেখাতে পারেন, তবে এ পুরস্কার জিততে পারবেন। অলৌকিক কাজগুলো হচ্ছে—খামে পোরা টাকার নাম্বার বলে দেয়া, টাকার নোটের ছবুছ আরেকটি তৈরি করা, যে জিনিষটি চাওয়া হবে তা শূণ্য থেকে নিয়ে আসা, মানসিক শক্তি বলে একটি কঠিন বস্তুকে বাঁকানো, টেলিপ্যাথির সাহায্যে আরেক জনের মনের খবর জেনে নেয়া, যোগবলে শূণ্যে ভেসে থাকা, এক স্থানে শরীর ত্যাগ করে অন্য স্থানে আবির্ভূত হওয়া, ছবি তোলা যায় এমন একটি ভূত বা আত্মা নিয়ে আসা ইত্যাদি। এখানে লক্ষণীয় যে, কোভুর তাঁর চ্যালেঞ্জে এমন সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যা অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারেরা সচরাচর ঘোষণা করে থাকেন। এঁর মধ্যে কেউ কেউ কোভুরের চ্যালেঞ্জ সাহস করে গ্রহণ

করেছিলেন, কিন্তু শেষমেশ সবাই কোভুরের হাতে ধরা পড়ে মান-সম্মানসহ জামানতের টাকা পর্যন্তও খোয়েছেন। এবার আমরা যার কথা বলব, আমার মনে হয়, তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশের পাঠকদের সাথে নূতন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার নেই। তিনি এ উপমহাদেশের যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ প্রবীর ঘোষ; অনেকের কাছে ভূতের পুলিশ। তাঁর ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সম্পর্কে আমরা সবাই কম-বেশি জানি। প্রবীর ঘোষের লেখা অলৌকিক নয় লৌকিক, সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ, আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, প্রসঙ্গ সন্ধান এবং ... প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলাদেশের বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজসচেতন পাঠকের কাছে তুমুল জনপ্রিয়। অনেকেরই জানা আছে, প্রবীর ঘোষ তাঁর সমিতির মাধ্যমে জ্যোতিষ, ফেং শুই, রেইকি গ্রাণ্ডমাস্টার, অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের প্রতি বিশ লক্ষ ভারতীয় রুপি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন। এই চ্যালেঞ্জ বলবৎ থাকবে প্রবীর ঘোষ জীবিত থাকা পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবান খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত। দুঃখের বিষয়, একজন অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারও নিজের অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিতে পারেননি এখনো। জানা গেছে আজ পর্যন্ত প্রবীর ঘোষ এবং যুক্তিবাদী সমিতির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পরাজিত হয়েছেন হাজারখানেক "অলৌকিক" বাবাজী-মাতাজী, বিধবস্ত-পলাতক জ্যোতিষীর সংখ্যা পৌনে দু'শ অতিক্রান্ত আর তাঁরা ভুতুরে বাড়ি বা ভূতের ভর ধরেছেন শ'খানেক। প্রবীর ঘোষ বলেন, "অনেকের কাছে চ্যালেঞ্জ শব্দটি অশোভন মনে হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য পর্যায় হল — চ্যালেঞ্জ। প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে যে গল্পের গরুগুলো গাছে চড়ে বসেছে, তাদের মাটিতে নামিয়ে এনে আবার ঘাস খাওয়ানোর জন্যই এই চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ বাস্তব সত্যকে বড় বেশি স্পষ্ট করে তোলে। সাধারণ মানুষের কাছে আজকের জনপ্রিয় প্রশ্ন এটাই — চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেই দাবি প্রমাণ করা যায়, বাস্তবসত্যকে জানা যায়, সেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দ্বিধা থাকবে কেন?" তিনি আরো বলেন, — "আমি চাই, আমার এই চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে আরো কিছু মানুষ বুঝতে শিখুন, বিশ্বাস করতে শিখুন, অলৌকিক ক্ষমতাবান কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব এ বিশ্বে নেই। অলৌকিকতা যা আছে, তা শুধুই পত্র-পত্রিকা, ধর্মগ্রন্থ ও বইয়ের পাতায়।" প্রবীর ঘোষের যুক্তিবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ, নেপালসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানমনস্ক-সমাজ সচেতন মানুষেরা তাঁদের নিজ নিজ সাধের মধ্যে যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন অপার্শ্বিক ক্ষমতার দাবিদারদের প্রতি, হাতেনাতে তাদের ভণ্ডামো উন্মোচন করে চলছেন, জনসাধারণদের শিখিয়ে দিচ্ছেন বুজরুক অপার্শ্বিক ক্ষমতাবানদের লৌকিক কৌশলগুলো। বাংলাদেশে এখনো যে সকল বুজরুক অলৌকিক ক্ষমতার দাবি করছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি — এতোই যখন আত্মবিশ্বাস নিজের ক্ষমতার প্রতি, তাহলে একটু কষ্ট করে প্রবীর ঘোষ প্রদত্ত চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করুন। চ্যালেঞ্জে জিততে পারলে, পাবেন আন্তর্জাতিক বিশাল খ্যাতিসহ বিশলক্ষ ভারতীয় রুপি, সাথে এ উপমহাদেশের অসংখ্য যুক্তিবাদী মানুষ, যারা আপনার খাসবান্দা হিসেবে আজীবন সেবা করে যাবে নির্দিধায়। প্রবীর ঘোষের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা:— প্রবীর ঘোষ, ৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কলকাতা- ৭০০০৭৪। আর পাঠক, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বুঝুন — যুক্তিবাদী-বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে এ সমাজ-পরিবেশ অনুকূলে নয়; প্রতি পদে-পদে প্রথা-নীতি-নৈতিকতার নামে ভণ্ডামোর শিকল লাগানো। মৌলবাদী-ধর্মোদ্ধ-দালাল আর শাসকশ্রেণির "সুপারগু" লাগানো সম্পর্কের ফলে কখনোই কাজিফত সমাজ গঠন সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না আপামর জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠবে। তাই সমাজসচেতন পাঠক, আপনার সহযোগিতার বড় প্রয়োজন, আগামীদিনের শ্রেণিহীন-শোষণহীন-ভণ্ডামোমুক্ত-প্রতারকমুক্ত সাম্যের সমাজ গঠনের জন্য। আমরা আপনার অপেক্ষায় আছি। আপনার হাতটি বাড়িয়ে দিন।

মুক্তমনার একজন নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। সংরক্ষনশীল সনাতন ধর্মের মিথ, কুসংস্কার এবং অনুদার সমাজ কাঠামোর একজন প্রবল সমালোচক। মানবতা এবং যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৬ সালে মুক্তমনা এওয়ার্ড পেয়েছেন।